# আনন্দমেলা

অশোক বসুর
সম্পূর্ণ উপন্যাস
লুকানো সোনা

৩০ নভেম্বর ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

## পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সোমনাথ দাসগুপ্ত ( শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী)
স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘামিত্রা সরকার
এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম
মিসিং পেজ দিয়েছেন - অর্ণব দাস ও আদি

# যেদিন আম্মার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো

**ফরহ্যান্স** ফ্লোরাইড

**স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।**

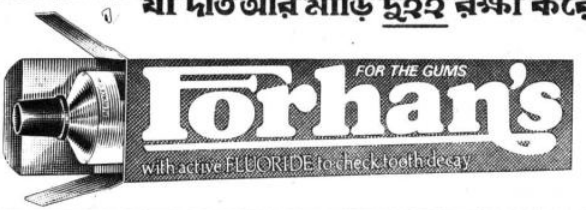


331F 172 BEN

# আনন্দমেলা


সম্পূর্ণ উপন্যাস
*লুকানো সোনা* ৪৬
অশোক বসু

গল্প
*বিজন রায়ের চশমা* ১০
তারাপদ রায়
*শিম্বা-টাম্বো* ৩৮
গীতা চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস
*নোটোর দল* ১৯
লীলা মজুমদার

ছড়া
*ছড়ার গুঁতো* ৫
আনন্দ বাগচী
*বাগানের রাজা* ৪৫
বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর-ক্লাসিক
*দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব টম স্যায়ার* ২৭
ভাষান্তর : শেখর বসু

স্মৃতিকথা
*ব্যাটে-বলে* ৩১
পঙ্কজ রায়

ভ্রমণকাহিনী
*সুন্দর মিরিক* ৬
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

খেলাধুলো
*কানপুরে ভারত ভেঙে পড়ল* ৮৪
মণি শর্মা
*মঞ্জরেকর চলে গেলেন* ৮৫
অশোক রায়
*দিল্লিতে মার্শালের মোকাবিলা* ৮৬
মণীশ মৌলিক
*সোভিয়েত সার্কাস* ৮৯
অহিভূষণ মালিক

সেইসঙ্গে কমিক্স, ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও অন্যান্য আকর্ষণ

প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ


কেউ খুব খুশি পরীক্ষা দিয়ে,
কারও পরীক্ষা দরজায়
সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে
এখন ভীষণ গর্জায়।
গর্জাক, তাতে নেই কারও ডর,
পড়া তো করেছে সকলে,
সেই কারণেই সেরা-নম্বর
আসবে তাদের দখলে।


১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা


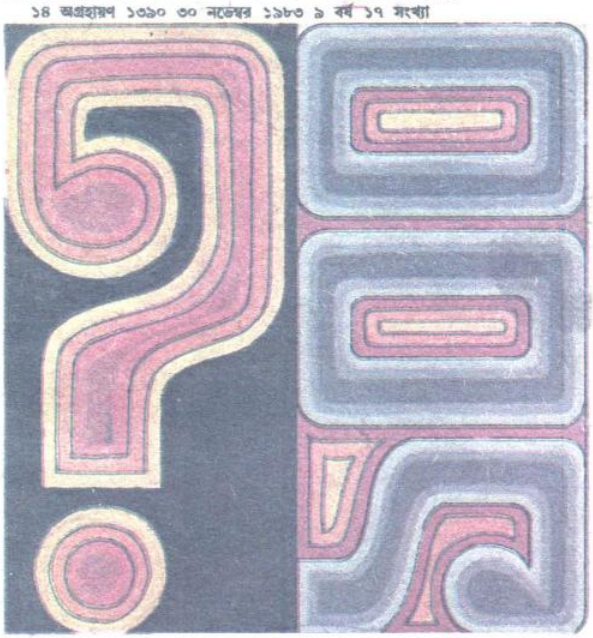


**সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাসন্তিদেবী রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

# An Apology
# And An Assurance

Our readers and advertisers are aware of the disastrous fire that broke out on Friday the 14th of October 1983 in the premises of our printers in Dum Dum. We have taken expeditious steps to make sure that production of our magazines is continued with the minimum dislocation. We are happy to inform that arrangements have been completed in this regard.

Inspite of these efforts we are sorry that we are compelled to suspend two issues of Sunday dated 23.10.83 and 30.10.83 and one issue of Ravivar dated 16.10.83.

There is no other dislocation and all our publications will appear as on schedule.

Readers and advertisers will, we are sure, bear with us for the minor dislocation that suspension of the above mentioned issues will create.

We would like to assure our advertisers that all their advertising will be carried by our publications with the inevitable minor adjustments as necessitated by the circumstances mentioned above.

We would like to thank most sincerely all those who have helped us to overcome this major set-back in the shortest possible time.

Our grateful thanks to our readers, advertisers and our staff.

**The Ananda Bazar Group of Publications**

6 Prafulla Sarkar Street Calcutta 700 001

# ছড়ার গুঁতো

## আনন্দ বাগচী

দাদা কন, হিজিবিজি কী যে-লেখো গদ্য
ও তো পারে গোঁফ যার গজিয়েছে সদ্য।
কাগের বগের ঠ্যাং মাছিমারা স্টাইলে—
চলেছে তো চলেছেই ডালভাঙা মাইলে!
রাখো বাপু ওই সব, এক্ষুনি ছড়া চাই
হোমটাস্ক! না দিয়ে তো ঠাঁই ছেড়ে নড়া নাই!
ছড়াটে কবিতা হোক ছিরকুটে পদ্য
ষোল লাইনের কমে ক্ষমা নেই অদ্য।
মাথায় আকাশ ভাঙে, গায়ে স্বেদ, কম্প
কে বাজায় ঢোল-কাঁসি, কানে জগঝম্প!
ছন্দের মিল দেওয়া দরজার খিল নয়
গোটা-দুই ডট পেন চর্বণে হল ক্ষয়।

ষোল লাইনের মাপে ভ্রাতাটিকে দেখে
দাদা এসে চমকান বসে আছে এ কে?
গোঁফঝুল পরচুল কুটকুটে দাড়ি
কাকতাড়ুয়ার মতো মুখ কেলো হাঁড়ি!

ছবি : দেবাশিস দেব

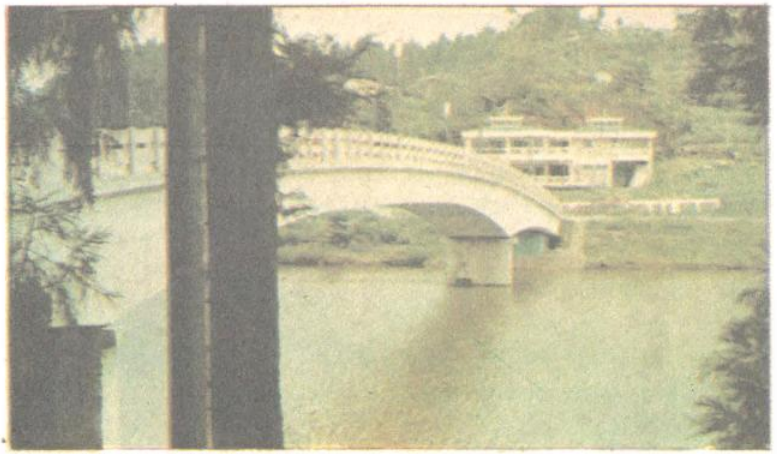

*লেকের উপর সেতু, ওপারে ডে-সেন্টার*

# সুন্দর মিরিক

## গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ভ্রমণের নেশায় কত জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াই। অদেখা, অচেনার আনন্দে বেরিয়ে পড়ি দূর-দূরান্তরে। তবু 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' সেই আলো-ঝলমল ছোট শিশিরবিন্দুটিকে। এইরকমই এক অসাধারণ সৌন্দর্যখনি মিরিক-উপত্যকা। পর্যটক মহলে মিরিকের নাম সদ্য শোনা গেলেও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মিরিকের সৌন্দর্যের কাছে শৈলরানী দার্জিলিংও যেন অনেকখানি ম্লান। অনেকে মিরিককে 'দ্বিতীয় কাশ্মীর' বলেন। কথাটি অতিরঞ্জিত নয়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না মিরিক কত সুন্দর!

'মিরিক' শব্দটি লেপচা ভাষা থেকে এসেছে। যার অর্থ পোড়া পাহাড়। আশ্চর্যের ব্যাপার, মিরিকের কোথাও পোড়া চিহ্নমাত্র নেই। বরং প্রকৃতি যেন অকৃপণভাবে মিরিককে সাজিয়ে রেখেছে। দীর্ঘদিন মিরিক লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, কদাচিৎ দু-একজন পর্যটক মিরিকে বেড়াতে আসতেন। বছরখানেক আগেও দার্জিলিং থেকে মিরিকের পথে বাস চলাচল ছিল না।

অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে নলিনীকান্ত মজুমদার মহাশয় দার্জিলিং থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মিরিকে বেড়াতে আসেন। শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের পথও ছিল খুব দুর্গম। নলিনীকান্ত মহাশয় মিরিক ভ্রমণের বর্ণনায় লিখেছেন, "সীমানা হইতে একটি পথ কখনও উৎরাই কখনও চড়াইভাবে ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্তবর্তী গভীর অরণ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে মিরিক অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বিশাল-দেহ মহীরুহগুলির ঘনপত্রজাল ভেদ করিয়া সূর্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া বনের ভিতর স্যাঁতসেতে ও অন্ধকার। পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষগুলিতে অসংখ্য জলৌকা পথিকের

দর্শনমাত্রই কিলকিল করিতে থাকে এবং উপর হইতে নিম্নে পতিত হইয়া পায়ে আঁকড়াইয়া ধরে। ....বুটজুতা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রক্ত শোষণ করে।"

আজকের মিরিকের চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। রীতিমত আলো-ঝলমলে শৈলশহর। মিরিকের অন্যতম আকর্ষণ লেক। আগে নাম ছিল সৌমেন্দু, বর্তমানে লেকের নাম রাখা হয়েছে কৃষ্ণনগর লেক। লেক অঞ্চলটির নামও কৃষ্ণনগর। মিরিকের লেক সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি শোনা যায়।

মজুমদারমহাশয় তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "একদা এই তড়াগ সুন্দর স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ছিল। .....একদা এক সাহেব হংসদম্পতির প্রাণ হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দেবতা, মিরিক হইতে অন্তর্ধান হইয়াছেন। এবং তদভিশাপে ঝর্নার স্বাভাবিক জল বন্ধ হয়।" কেউ-কেউ বলেন, ১৯৪৩ সালে মিরিকের কাছে থরবু চা-বাগানের ম্যানেজার হ্যাডহেকসাহেব এই জলাশয়টির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তাঁর প্রচেষ্টায় একবার লেকের খনন কার্য করানো হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল আবার অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকে সেই লেক। নোংরা আবর্জনায় জলাশয়টি ভর্তি হয়ে যায়। গত ১৯৭৩ সাল থেকে সরকারিভাবে মিরিকের উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। দ্রুত উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর উঠেপড়ে লাগেন এবং লেকটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। সারা বছর যাতে লেকে জল থাকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। মিরিক লেকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শ্রেণীবদ্ধ বিশাল পাইনবন এবং শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। কাশ্মীর, শিলং কিংবা নৈনিতালের লেকের মতো লেকের জল এখনও দূষিত হয়নি।

মিরিক পৌঁছুতে হলে প্রথমেই আসতে হবে উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি শহরে। এখান থেকে সিকিম, ভূটান,

*মিরিক লেক, যেন 'দ্বিতীয় কাশ্মীর'*

নেপাল তথা আসামের যে-কোনো অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে প্রতিদিন নিয়মিত বাস ছেড়ে যায় মিরিকে যাবার জন্য। দূরত্ব ৫২ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি ছাড়ালেই চোখে পড়বে চা-বাগান। শিমুলবাড়ি চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে বামনপুকুরের সেগুন বনের ছায়া-ছায়া পথ এসে দাঁড়াবে দুধিয়ায়। দুধে-আলতার মতো রঙ। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী বালাসন। ওপারে পানিঘাটা দুধিয়া থেকে গভীর চা-বাগানের মধ্যে চড়াই-উতরাই। পাহাড় এখানে খুব খোলামেলা। কোথাও-কোথাও দেখা যাবে, গোটা পাহাড়টা যেন মখমলের মতো সবুজ কার্পেট মোড়া। তার মাঝখান দিয়ে যেন পথ কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। এ-দৃশ্য দার্জিলিং জেলার কোথাও চোখে পড়বে না। দূর থেকে মনে হবে ঠিক যেন পটে আঁকা ছবি। পাতা তোলার দিন যখন রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে চা-শ্রমিকরা বাগানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, মনে হয়, সবুজ সমুদ্রে বিচিত্র রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। দু পাশের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে কখন যে নিবিড় পাইনবনের রাজত্বে প্রবেশ করবেন টেরই পাবেন না। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। কখনও কেউ ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে নির্জন চা-বাগানের পথে। টিলার উপর চুপটি করে দাঁড়িয়ে-থাকা একটি লোক, টেলিগ্রাফের তারে ঝাঁক-ঝাঁক টিয়া, এক নিমেষে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মিরিক লেক। দু' কিলোমিটার দূরে মিরিক বাজার।

আগেই বলা হয়েছে মিরিকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ লেক। লেকের জলের গভীরতা তিন ফুট থেকে একুশ ফুট। লেকের পুব পাশে ডে-সেন্টার। পাইনবন থেকে যাতায়াতের জন্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি সেতু ডে-সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। লেক থেকে কয়েকশো ফুট ওপরে পাইনবনের মধ্যে বহু পুরাতন শিবমন্দির। স্থানীয় লোকেরা বলেন দেবীস্থান। প্রতিদিন পূজা না হলেও স্থানটির মাহাত্ম্য আছে। চারিদিকে স্যাঁতসেতে পরিবেশ। লতাগুল্ম ভেষজ গাছ। প্রচুর তেজপাতা, এলাচ আর বিচিত্র অর্কিড। অনেক পর্যটক লেক দেখতে এসে এ জায়গাটি দেখতে ভুলে যান।

মিরিক লেকের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তুলেছে পার্কস অ্যাণ্ড গার্ডেনের তৈরি সুবিশাল পুষ্প-উদ্যান। উদ্যানের মাঝখান দিয়ে সরু কাঁকর-বিছানো পথ। শীতকালে মরসুমি ফুলের মেলা। কাশ্মীর, নৈনিতালের মতো লেকে নৌকাবিহার লেগেই আছে। মেঘ-কুয়াশার মধ্যে নৌকা-ভ্রমণ সত্যি আনন্দদায়ক। মিরিককে কেন্দ্র করে আশপাশের কয়েকটি দ্রষ্টব্যস্থল বেড়িয়ে আসা যায়। যেমন রামতিডারা, রাইভাপ এই দুটি জায়গা অসাধারণ পিকনিক স্পট। এখান থেকে বরফাচ্ছাদিত কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

মিরিকের কাছাকাছি অনেকগুলি সুন্দর কমলাবাগান। মিষ্টত্বের জন্য মিরিকের কমলালেবুর সুনাম যথেষ্ট। ডুপটিং মারমা, সৌরেনি, ওকাইতি অঞ্চলে প্রচুর কমলাবাগান আছে। শীতের সময় মিরিক-বাজারে কমলালেবু ওঠে। হাতে সময় পেলে আশেপাশের গ্রাম-বস্তিতে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীরা খুব সহজ, সরল প্রকৃতির। মিরিকের লাগোয়া কার্শিয়াং উচ্চতায় মিরিকের সমানই। মিরিক থেকে চোরবাটাতে যাওয়া যায়। পথেই পড়বে রিচিংটং। মিরিকে অসুবিধা এখন একটাই তা হল সরকারি কোনো লজ বা ইয়ুথ হোস্টেল নেই। নেই কোনো ভাল হোটেল। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি ছোটখাটো অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যাবে। কাশ্মীরের মতো সুন্দর মিরিক একদিন দ্বিতীয় ভূস্বর্গরূপে পরিচিতি লাভ করবে।

# বিজ্ঞানবিচিত্রা

চঞ্চল পাল

### *খসে-যাওয়া লেজ*

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, টিকটিকির লেজে হাত দিলে লেজটা খসে পড়ে, আর বেশ কিছুক্ষণ সেটা আপনা-আপনি নড়তে থাকে। সম্প্রতি এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী—বেঞ্জামিন ডায়াল ও লয়েড ফিজ্‌প্যাট্রিক। ওঁরা দেখেছেন যে, গিরগিটি জাতীয় জন্তুদের ভক্ষকরা যখন তাড়া করে তখন গিরগিটিরা পালাবার সময় লেজ খসিয়ে দেয়। ভয়ে নয়, ভক্ষকদের ঠকাবার জন্যেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, খসে-যাওয়া লেজটা এত জোরে কাঁপে যে, সাপ বা বেড়াল জাতীয় ভক্ষকদের মনোযোগ চলে যায় লেজের দিকেই। ওরা তখন লেজটার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সুযোগে গিরগিটিরা পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। আফ্রিকার 'স্কিঙ্ক' প্রজাতির গিরগিটির খসে-যাওয়া লেজ মিনিটে প্রায় ৩০০ বার কাঁপে আর শিকারি জন্তুরা ভাবে ওটাই বোধহয় আসল গিরগিটি—ভয়ে বা রাগে অত জোরে কাঁপছে।

### *দুধের গাছ*

একটা গাছের বীজের সঙ্গে আর একটা একই ধরনের গাছের বীজের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন ধরনের বীজ তৈরি করা গেছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু দুটো আলাদা ধরনের গাছের বীজের সংমিশ্রণ ঘটানো খুব শক্ত। কিছুদিন আগে জার্মানিতে আলু আর টোম্যাটো গাছের বীজে মেশামিশি করানো গেছে। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী টোম্যাটো গাছের বীজের সঙ্গে গোরুর দেহের কোষ মিশিয়ে ফেলতে পেরেছেন। ফলে, সেই বীজ যখন পোঁতা হয়েছে তখন এমন একটা গাছ জন্মেছে যার ফল দেখতে অনেকটা টোম্যাটোর মতোই কিন্তু ভেতরের শাঁসে রয়েছে দুধের সমস্ত প্রোটিন আর ভিটামিন। বিজ্ঞানী দুজনের নাম ডঃ ব্যারি ম্যাক্‌ডোনাল্ড এবং উইলিয়াম উইম্‌পি। এঁরা যা কাণ্ড করে ফেললেন তাতে মনে হচ্ছে দুধ, মাংস ইত্যাদি পশুজাত দ্রব্যগুলো আর কয়েক দশক বাদে হয়তো গাছেই ফলবে।

### *অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী*

আমেরিকার মোন্‌টানা প্রদেশের মেরামেক নদীর ধারে ছোট্ট শহর টাইমস্‌-বিচ। এখানে একটা নামকরা ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে। এই ধরনের মাঠে এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ছড়ানো হয় যাতে ধুলো ওড়ে কম বা উড়লেও তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়ে। রাসেল ব্লিস নামে একজন সবজান্তা ব্যবসায়ী দেখলেন 'টি-সি-ডি-ডি' নামে একটা রাসায়নিক দ্রব্য এ-ব্যাপারে খুব কাজ দেয়। তাই তিনি ঘোড়দৌড়ের মাঠে এ-জিনিস সরবরাহ করে বেশ কিছু পয়সাও কামিয়ে ফেললেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল, ঘোড়াগুলো হঠাৎ মরে যাচ্ছে। যারা ঘোড়দৌড় দেখতে আসে তারাও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকী আশেপাশের গৃহপালিত জন্তুরাও অসুখ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তদন্ত করে দেখা গেল, দায়ী হচ্ছে ঐ টি-সি-ডি-ডি। তাই এখন সরকার আদেশ দিয়েছে যেখানে ঐ পদার্থের কণা খুঁজে পাওয়া যাবে সেখানটা নষ্ট করে ফেলতে—তা সে খেত-খামারই হোক বা বাড়িঘরই হোক। নাগরিকদের তো মাথায় হাত! উপযুক্ত পরীক্ষা না করে জিনিসপত্র বাজারে ছাড়লে পরিবেশ যে কতটা দূষিত হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এটাই।

# বিজন রায়ের চশমা

তারাপদ রায়

বিজন রায় একজন সরল প্রকৃতির সাধারণ লোক। তিনি একটা সরকারি অফিসে ছোট কাজ করেন। সময়মতো অফিস যান, বিচারবুদ্ধিমতো যেটুকু কাজ তাঁর সেটা করার চেষ্টা করেন। আবার ঠিক সময়ে অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

সন্ধ্যায় -সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা খুব পছন্দ বিজনবাবুর। কিন্তু কলকাতার আজকাল যা হালচাল ; এই বৃষ্টিতে রাস্তা ডুবে গেছে, এই মিছিল বেরিয়েছে, কিংবা কোথাও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, ময়দানে খেলা ভেঙেছে কিংবা বিদ্যুৎ বন্ধ রাস্তায় ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে ইত্যাদি নানা কারণে একেকদিন যানবাহনের বড় দুরবস্থা হয়। সেদিন বিজনবাবু আর গাড়িটাড়ির ভরসা না করে সোজা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরেন। একটু সময় লাগে, বৃষ্টি-টৃষ্টি হলে কিছুটা কষ্ট হয় তবুও নিজের পায়ে আসতে বিজনবাবুর খুব খারাপ লাগে না। তাছাড়া বিজনবাবুর বাড়িও অফিসের তিন-চার মাইলের মধ্যে, খুব অসুবিধে কিছু হয় না।

আজ সন্ধ্যায়ও বিজনবাবু হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলেন, ময়দানে কী একটা সভা ছিল, সভা-ফেরত লোকের ভিড়ে গাড়িঘোড়া সব আটকে গেছে, সে জট কখন খুলবে তার ভরসা নেই।

বিজনবাবু ছাতা নেওয়া পছন্দ করেন

না। একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল আশ্বিনের সন্ধ্যায়, তিনি সামান্য ভিজে গিয়েছেন। সে কিছু নয়, বাসায় ফিরে মাথাটা মুছে, জামা-প্যান্ট ছেড়ে ফেললেই হবে। কিন্তু বাসার গলির মুখে এসে বিজনবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা পাড়া অন্ধকার, আজ আবার বিদ্যুৎ বন্ধ। কখন আলো আসবে কে জানে, এই সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই অনেক রাত পর্যন্ত আলো আসেনি।

অন্ধকারে পিছল রাস্তায় একটু সাবধানে হেঁটে বিজনবাবু যখন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখতে পেলেন দরজার কাছেই অন্ধকারে কে একজন তাঁরই মতো শার্ট-প্যান্ট পরা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ সে এগিয়ে এসে বিজনবাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "গুড ইভনিং স্যার।"

বিজনবাবু সামান্য সাদামাটা মানুষ। করমর্দন করার অভিজ্ঞতা তাঁর প্রায় নেই বললেই চলে, তাছাড়া গুড মর্নিং, গুড ইভ্‌নিং ইত্যাদিও তাঁর রপ্ত নয়, তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়ানো অচেনা লোকটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

বুঝতে খুব দেরি হল না, কারণ করমর্দন শেষ করেই কেমন একটা কাঁচুমাচু কণ্ঠে অন্ধকারের লোকটি বলল, "স্যার, আপনি কি আমাকে দুটো টাকা ধার দিতে পারেন?"

বিজন রায় যত ভাল লোকই হোন, তাঁকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় তিনি ততটা বোকা নন। এই কলকাতা শহরে তিনি কত রকমের জোচ্চোর দেখেছেন। তিনি প্রথমে ভাবলেন এই লোকটা বুঝি সেই রকমের একটা জোচ্চোর। কিন্তু তারপরই তাঁর খেয়াল হল সব জোচ্চোরই টাকা চায় কোনো অজুহাত বা লোভ দেখিয়ে, কিন্তু এই লোকটি সরাসরি দুটো

# হাজার হাজার গৃহিণীরা যা মানে...
# স্বস্তিক পপুলার সম্পর্কে অমিতা-ও তাই জানে...

**"হ্যাঁ, সাশ্রয় আমি চাইতাম বটে, তবে সঙ্গে কোয়ালিটিও। আর স্বস্তিক পপুলার একদম তাই। এর দাম অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে কতো কম অথচ কাচা হয় কি দারুণ!"**

**নীল রঙের স্বস্তিক পপুলার নানান গুণে ভরপুর এক চমৎকার পাউডার:**

- এটি স্প্রে-ড্রায়েড হওয়ার দরুন জলেতে চটপট গুলে যায়।
- এতে অপ্টিক্যাল হোয়াইটেনার মেশানো থাকার দরুন কাপড় বেশী পরিষ্কার ও ধবধবে চমৎকার ধোয়।
- এতে জল মিঠে বানানোর এক বিশেষ উপাদান থাকার দরুন খর জলেও ধোয়া খুবই সহজ।
- এটি স্বস্তিক-এর রিসার্চ দ্বারা তৈরী এক উৎপাদন হওয়ায় দরুন অন্যান্য নামকরা ডিটারজেন্ট পাউডারের চেয়ে দামে কতো কম অথচ ধোয় কি দারুণ।
- ২.৫ কিলো, ১ কিলো আর ৫০০ গ্রামের পলিপ্যাকে পাবেন।

স্বস্তিক

# পপুলার

ডিটারজেন্ট পাউডার

সবচেয়ে কম দাম অথচ কাজে কতো সুনাম

১ কিলো কেবল ১০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

Shilpi DM 17/83 Ben.

টাকা চাইছে। আর দুটো টাকা বিজনবাবুর কাছে পকেটেই রয়েছে। এই লোকটাকে দিলে খুব কি একটা ক্ষতি হবে ?

বিজনবাবু মাসের প্রথমে অফিস থেকে মাইনে আনার সময়ে একটা দু-টাকার একশো নোটের বাণ্ডিল নেন। দৈনিক অফিসে যাওয়ার সময় সেই বাণ্ডিল থেকে দুটো করে নোট বার করে নেন। একটা নোটে তাঁর অফিসে চা-জলখাবার খুচরো খরচ হয়ে যায়, আরেকটা নোট বিশেষ যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে সেই জন্যে।

সেই দ্বিতীয় নোটটা তখন বিজনবাবুর পকেটে রয়েছে। মাত্র দু-টাকার ব্যাপার, দিলে কিছু আসে যায় না, কত টাকাই তো কতভাবে নষ্ট হয়। আর এই লোকটা নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধেয় পড়েই চাইছে, তা না হলে অচেনা লোকের কাছে কেউ সামান্য দুটো টাকা ধার চায়।

এই সব বিবেচনা করে বিজনবাবু পকেট থেকে টাকা দুটো বার করে লোকটিকে এগিয়ে দিলেন। অন্ধকারের মধ্যে লোকটি টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বিজনবাবুর হাতের মধ্যে কী একটা জিনিস গুঁজে দিল । বিজনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "এটা আবার কী ?" সেই লোকটা বলল, "স্যার, এটা আমার চশমা। আপনার কাছে রইল, কাল টাকা দিয়ে ফেরত নিয়ে যাব।"

চশমাটা হাতে ধরে বিজনবাবু খুব অস্বস্তিতে পড়েছেন, তাড়াতাড়ি লোকটিকে বললেন, "না-না, চশমাটা আপনি ফেরত নিয়ে যান, সামান্য দু'টাকার জন্যে চশমা বন্ধক রাখতে হবে কেন ? আমি এই বাড়িতেই থাকি, যে দিন ইচ্ছে টাকাদুটো দিয়ে যাবেন। আমি বাসায় না থাকলে..."

লোকটি বিজনবাবুর প্রতিবাদের জন্যে অপেক্ষা না করে হনহন করে সামনের দিকে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে বিজনবাবু সে লোকটির চশমাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে অগত্যা বাড়িতে চলে গেলেন।

এই দু-টাকা ধারের ব্যাপার এবং প্রাসঙ্গিক চশমাটার কথা বিজনবাবুর আর খেয়াল ছিল না, পরদিন মনে পড়ল অফিসে যাওয়ার সময় যখন অফিসের শার্টটা গায়ে দিয়েছেন, উপর পকেটে চশমাটা দেখে। পকেট থেকে চশমাটা বার করে তিনি দেখলেন, কাল রাতে অন্ধকারে দেখা হয়নি। সাধারণ চশমা একটা, কালো ফ্রেমের ময়লা পুরনো চশমা, একটা কাঁচ যেন একটু ঢলঢলে।

বিজনবাবু চশমাটা পকেটেই রাখলেন। লোকটা সম্ভবত সন্ধ্যাবেলা বাড়ির দরজায় দুটো টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে চশমাটা ফেরত নেবার জন্যে।

বিজনবাবুর নিজের একটা চশমা আছে, সেটা লেখাপড়ার জন্যে দরকার পড়ে, এমনিতে লাগে না। সেটা থাকে অফিসের একটা ব্যাগের মধ্যে। অফিসে ঢুকে নাম সই করার সময় অন্যান্য দিনের মতো আজকে ব্যাগ থেকে নিজের চশমাটা বের না করে উপর পকেট থেকে বন্ধকি চশমাটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে তিনি হাজিরা খাতায় সই করতে গেলেন।

কতকাল ধরে এই হাজিরা খাতায় সই করছেন বিজনবাবু, সে প্রায় বারো-চোদ্দ বছর হবে। আজকে হঠাৎ এই চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখলেন হাজিরা খাতাটা কেমন যেন একটা বর্ষার দিনের সমুদ্রের মতো। বড়-বড় ঢেউ উঠছে, নামছে, ফেনা উঠছে, বালির চড়ায় আছড়ে পড়ছে জল। হাজিরা খাতায় শেষপাতার খুব নীচের দিকে একশো সতেরো নম্বর দাগে বিজন রায়ের নাম, বিজনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন এই সমুদ্রের একেবারে শেষ মাথায় তটভূমির কাছাকাছি তাঁর নামটা রয়েছে, সেখানে খুব বেশি ঢেউ-টেউ নেই, একটু দূরেই বালির

উপরে কয়েকটা ঝিনুক পড়ে রয়েছে।

বিজনবাবু খুব অবাক হলেন। এই হাজিরা খাতাটা এরকম, তিনি জীবনে কখনো ভাবেননি। তখনো তিনি বুঝতে পারেননি এরকম হচ্ছে এই চশমাটার জন্যে।

বুঝতে পারলেন দশ মিনিট পরে। টেবিলে একটা ফাইল রয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বিজনবাবু সকাল-সকাল ফাইলটা সেরে ফেলতে চান, কিন্তু এই চশমাটা চোখে দিয়ে ফাইলটা যেই পড়তে গেছেন, দেখেন, অক্ষর-টক্ষর কিছু পড়া যাচ্ছে না, মনে হল সাদা কাগজের উপরে অসংখ্য কালো পিঁপড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে পিঁপড়েগুলো চলা শুরু করল। উপরের সারির পিঁপড়েগুলো নীচের দিকে নামতে লাগল, নীচের গুলো উপরে উঠতে লাগল।

অবাক কাণ্ড! বিজনবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে দেখলেন, না, নথিটা ঠিকই আছে, যেমন অন্য সব ফাইল হয়, চিঠিপত্র, নোট, অর্ডার। কিন্তু আবার চশমাটা চোখে দিয়ে দেখলেন, সব একাকার হয়ে, সারি-সারি ছোট কালো পিঁপড়ে, প্রত্যেকটা অক্ষর একেকটা পিঁপড়ে হয়ে গেছে, তারা আবার নিজেদের মধ্যে নড়চড়া, ওঠানামা করছে।

বিজনবাবু চশমাটা চোখে দিয়ে ফাইলের

ভিতরে পিপড়েদের ওঠা-নামা দেখছিলেন হঠাৎ চমক ভাঙল সহকর্মী নিখিলবাবুর কথায়, "এই যে বিজন, এ চশমাটা তো তোমার নয়? এটা কোথা থেকে হাতালে?"

নিখিলবাবুর কথার ভঙ্গি কখনোই বিজনবাবুর ভাল লাগে না, কেমন বাঁকা-বাঁকা কথা, লোকটাকে বড় শয়তান বলে মনে হয়। এখন এই চশমাটা চোখে, ফাইল থেকে মুখ তুলে বিজনবাবু দেখতে পেলেন, না, নিখিলবাবু লোকটা শয়তান নন, পুরো একটা আস্ত হনুমান। কুতকুতে চঞ্চল চোখ, চ্যাপ্টা পোড়া মুখ, সেই সঙ্গে আস্ত একটা সাড়ে-তিন হাত লেজ।

নিখিলবাবু অযাচিত মন্তব্যটি করেই বিজনবাবুর প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলেন, বিজনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন নিখিলবাবুর পিছনে-পিছনে তাঁর বড় লেজটা দুলতে দুলতে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে রামলাল বেয়ারা এসে জানাল, "বড়সাহেব ডাকছেন।" কৌতূহল সহকারে রামলাল বেয়ারাকেও বিজনবাবু খুব খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। রামলালকে একেবারে একটা ভোঁদড়ের মতো দেখাচ্ছে। চিড়িয়াখানার যে বড় ভোঁদড়টা কয়েক মাস আগে মারা গেছে, রামলালকে ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে।

বিজনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে একটা

হলঘরের মধ্য দিয়ে বড়সাহেবের ঘরে যেতে হয়। আশ্চর্য, চশমাটা চোখে দিয়ে হলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিজনবাবু লক্ষ করলেন, হলঘরটায় তাঁর চিরপরিচিত রামবাবু, শ্যামবাবু, যদুবাবু বা মধুবাবু, কেউ নেই, কোনো কাজকর্মও হচ্ছে না শুধু কয়েকটা গোরু গাধা বসে-বসে জাবর কাটছে।

বিজনবাবু মনে মনে ভেবে নিলেন, বড়সাহেব লোকটা যা বিষাক্ত চরিত্রের ওঁকে নিশ্চয় একটা নেকড়ে বাঘ অথবা ময়াল সাপ দেখাবে। কিন্তু বড়সাহেবকে চশমার ভিতর দিয়ে দেখাল বিরাট ধড়, বিরাট মাথা, নাকের নীচে একটা খড়্গ, ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছেন বড়সাহেব, যিনি আসলে একটা গণ্ডার।

সেদিন আর বিজনবাবুর ভাল করে কোনো কাজ করা হল না। চশমাটা চোখে দিয়ে কিছুক্ষণ অফিসের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনেই বড় রাস্তা, লোকজন, ট্রামবাস। কিন্তু কোথায় কী? সব ভো-ভাল্লা। শুধু গোরু-গাধা-ছাগল-মোষ পালে পালে রাস্তায় চরছে। একপাল এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে, আরেক পাল ওদিক থেকে এদিকে আসছে।

বিজনবাবু তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। সর্বনাশ! এই চশমা চোখে দিয়ে আর বেশিক্ষণ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন বিজনবাবু। তারপর বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই গোলমেলে চশমাটা লোকটাকে ফেরত দিতেই হবে। সেই দু'টাকা যদি নাও দেয়, জোর করে গছিয়ে দিতে হবে। এটা কাছে থাকলেই চোখে দিতে কৌতূহল হবে, আর চোখে দিলেই সব গুলিয়ে যাবে।

সেই লোকটি কিন্তু এল না চশমাটা ফেরত নিতে বা টাকাটা শোধ দিতে। সদর


চকচক করলেই
সোনা হয় না

বাইরের চাকচিক্য কিছুই নয়। ভেতরের জিনিসটাই আসল। তাই সাজসজ্জায় না ভুলে খাঁটি দুলালের তালমিছরি কিনুন। বোতলের গায়ে যার নামে তালমিছরি সেই দুলাল চন্দ্র ভড়ের সই দেখে নিন। ঠকবেন না।

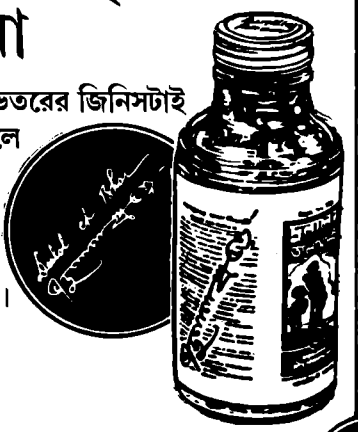

প্রস্তুতকারক :—

শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়

২৮ নং বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৫ ফোন : ৩৩-৮২৮৪

দরজায় রাত সাড়ে-নটা, দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিজনবাবুর পা ধরে গেল। একটু বাদে বাড়ির মধ্য থেকে ভাইপো এসে ডেকে নিয়ে গেল, "কাকা চলো, মা ডাকছে, ভাত বাড়া হয়ে গেছে।"

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিজনবাবু শুতে যাচ্ছেন এমন সময় বিজনবাবুর খেয়াল হল, আরে, এ চশমাটায় আমাকে নিজেকে কেমন দেখায় তা তো দেখা হয়নি। বিজনবাবুর ঘরে একটা পুরনো আমলের বড় আয়না আছে। চশমাটা পরে বিজনবাবু সেই আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং চমকে উঠলেন।

কালকে অন্ধকারে চশমার লোকটাকে তিনি ভাল করে দেখতে পাননি কিন্তু আয়নায় নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারলেন নিজে তিনি হুবহু ঐ লোকটার মতো দেখতে। তার চেয়েও অবাক কাণ্ড হল যখন আয়নার ছায়াটা কালকের মতো বিজনবাবুকে বলল, "গুড ইভনিং স্যার"। তারপর আয়নার মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে বিজনবাবুকে বলল, "এই যে আপনার টাকাটা।" বিজনবাবুও হতভম্বের মতো চোখ থেকে চশমাটা খুলে আয়নার মধ্যের লোকটার দিকে এগিয়ে দিলেন, লোকটি চশমাটা নিয়ে বিজনবাবুর হাতে কালকের সেই নতুন নোটটাই ফেরত দিল। তারপর আরেকবার "গুড ইভনিং স্যার," বলে আয়নার মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

বিজনবাবু নোটটা নিয়ে আলমারি খুলে দু'টাকার নোটের বাণ্ডিলের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, তাঁর কালকের নোটই বটে।

লোকটা কেন যে টাকাটা নিল, কেন যে উলটোপালটা চশমাটা জমা রাখল, এই সব আকাশপাতাল ভাবতে-ভাবতে বিজনবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

---

ছবি দেবাশিস দেব

# গুরুদক্ষিণা

## মৃণালকান্তি দাশ

কুস্তিটা শেখাতেন গামা,
ব্রুস লি কুংফু কারাটে—
হাত যেন শক্ত ঝামা,
কেউ কি পারবে হারাতে ?

ভালবেসে রোজ আলেখিন,
জোর করে শেখাতেন দাবা।
ছক পেতে বসি যেই দিন,
ভয় পান পাপানের বাবা !

ফুটবল শেখাতেন পেলে,
হকি শেখাতেন ধ্যানচাঁদ।
ব্রাডম্যান সবাইকে ফেলে,
বোঝাতেন ক্রিকেটের স্বাদ।

ছবি আঁকা শেখাতেন এসে
রাফায়েল, গগ্যাঁ, ভিঞ্চি—
ছবিগুলি বিকোয় বিদেশে
মাপ করে প্রতি ইঞ্চি !

তানসেন শেখাতেন গান
মল্লার, মিঞা কি টোড়ি—
ভুল হলে সুর, লয়, তান
ঘোরাতেন দু'হাতে ছড়ি।

গুল দেয়া সোজা কথা নয়,
খুঁজে নিই ঠিক লোক কিনা—
আপনিই গুরু মহাশয়,
গুলে নিন গুরুদক্ষিণা !

# ফ্ল্যাশ গর্ডন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# নোটোর দল

## লীলা মজুমদার

*আগে যা ঘটেছে :* ল্যাংড়া জানোয়ারদের নিয়ে নোটোর দল চিড়িয়াখানা বানিয়েছিল। দাদুর প্রাইজ-পাওয়া গোরু-বাছুর রাখার জন্যে একদিন ঘর খালি করতে হল। 'দুঃস্থ' পশুরা যায় কোথায় ? পরিবন নাকি ভয়ংকর জায়গা। পরিরা নোটোদের মা-বাবাদের হরিণ করে দিয়েছে। নোটো বলে, ওসব বানানো গল্প। ওখানে গেলে দুঃস্থরা নিরাপদে থাকবে। এক রবিবারে মেলা দেখার নাম করে ওরা বেরিয়ে পড়ে। মেলায় এক ওঝা অদ্ভুত গান শুনিয়ে নোটোর হাতে ভয়-তাড়ানি 'জ্ঞানের ওষুধ' দেয়। পশুদের নিয়ে ওরা পরিবনে ঢোকে। সেখানে অন্য গাছ, অন্য জন্তু, অদ্ভুত ফল, অদ্ভুত পাথর। অনেকটা গিয়ে কুমিরজলার নৌকোয় ওঠে সবাই। আশপাশের ডাঙার গাছের 'শুঁড়ি'গুলো ঝুপঝাপ জলে নেমে নৌকো ঘিরে ধরে। তখন সবাই গায়ে জ্ঞানের ওষুধ মাখে। কুমিরগুলোকে মনে হয় গোসাপ। দূরে পরি-দ্বীপ। তারপর ...

॥ ৬ ॥

বাতাস নেই, ঢেউ নেই, স্রোত নেই। গোসাপগুলোও ডাঙা ছেড়ে বেশি দূর এল না। ক্রমে তীরের সঙ্গে তফাতটা চওড়া হতে লাগল। তখনো পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সাড়াশব্দ নেই। যা ভেবেছিল নোটো, সম্ভবত তাই হয়েছে। বোমার দলবল হয়তো এতক্ষণে ছোট বনে ঢুকেছে। সেখানে দুঃস্থ পশুদের পায়ের ছাপ দেখে হয়তো তাজ্জব বনে গেছে। পশুরা যে মরে গেলেও দেখা দেবে না, তাতে সন্দেহ নেই। হুঙ্কার বেজায় বুদ্ধি। কুকুররা মানুষের গায়ের গন্ধে টের পায় কে বন্ধু কে শত্রু। চাই কি, জগৎ-জলার উল্টোদিকে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে খুপ্-খুপ্-খুপ্-খেউ-খেউ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই সব ভাবছিল নিমাই।

ওদিকে মৌ লটকানদের কী ভয়! 'কখন দ্বীপে পৌঁছবে নৌকো ? জলে কোনো আড়াল নেই। তীরে দাঁড়ালেই সব দেখতে পাবে যে!' নিমাই ধমক দিল, 'কী ক্যাঁওম্যাও কচ্ছিস তোরা ? দেখতে পেলেও দাদুর বন্দুক দিয়ে আমাদের কেউ মারবে না। পারলে ধরে নিয়ে যাবে। ঘাড়ে করে নৌকোও আনবে না নিশ্চয়। এতটা এগিয়ে গেছি, সাঁতরেও ধরতে পারে না। ওদের দম থাকে না দেখিসনি। তাছাড়া জলার ধারে পৌঁছবার অনেক আগেই আমরা দ্বীপে গিয়ে উঠব।'

নোটো দূরের দিকে চেয়ে ছিল। কোনো কথা শুনছিল কি না সন্দেহ। দ্বীপের আকারটা ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছিল। এখন তার তীরভূমি ঠাওর করা যাচ্ছে। বড্ড খাড়া পাথুরে পাড়ি ; একেবারে জলের কিনারা থেকে উঠেছে। এখানে নৌকো ভিড়ানো যাবে না। তাহলে কী করা যাবে ? এদের কাছে কিছু না বলাই ভাল। ছোটরা ভয় পাবে। যা ভিতু সব। মাথাগুলো ভয়ের গল্পে ঠাসা। ওটা কী ?

হঠাৎ চোখে পড়ল দ্বীপের বাঁক ঘুরে মস্ত একটা কালো পাখি নৌকোর দিকে উড়ে আসছে। এ যে তাদের সেই পাখি তাতে ভুল নেই। দাঁড়কাগটা নৌকোর ভাঙা ছইয়ের একটা কাঠের ওপর নামল। ঠোঁট দিয়ে গা পরিষ্কার করে হেঁড়ে গলায় বলল, 'ওদিকে ! ওদিকে ! ওদিকে !' ব্যস, অমনি

ডানা মেলে উড়ে গেল !!

নোটো তার ওড়ার পথের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল খাড়া পাড়ির আগাছার মধ্যে কোথাও নামল। বাকিদের মুখে খৈ ফুটতে লাগল। ততক্ষণে দ্বীপের আরো কাছে পৌঁছেছে ওরা। এদিকে যে নামবার জায়গা নেই, তা সকলেই বুঝেছে। উঁচু পাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কত রঙের পাথর। কত রকম ঝোপঝাপ, লতা, আগাছা। মাঝে মাঝে গর্তের মতো। জন্তু-জানোয়ার থাকে কিনা পরি-দ্বীপে কে জানে ? বোমা বলে, হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও ভয়ংকর হয় পরি-দ্বীপের পরিরা। যত্ত সব। মৌ বলল, 'ভুলুর দিদিমার ভাই না কে যেন বন-বিভাগে কাজ করত। সে নাকি বলেছে ওখানে ভূতের আস্তানা। পরিতে আর ভূতেতে খুব বেশি তফাত নেই। মাঝে মাঝে নাকি দ্বীপে দপ্ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বাতাসে বাঁশির সুর ভেসে আসে। তখন চোখ ঢাকতে হয়, কানে তুলো গুঁজতে হয়। পরিরা বড় ভয়ানক জাত।'

সকলের কান খাড়া। সত্যি সত্যি কানে আসছিল অদ্ভুত একটা শব্দ। অনেকটা একটানা বাঁশি বাজালে যেমন হয়। ছোটদের ভয় দেখে নিমাই ভারী বিরক্ত। সে বলল, 'ও নোটোদা, এদের বলে দাও না ও কিসের শব্দ।'

নোটো পাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'পাথরের কোনো সরু ফুটো দিয়ে বাতাস ঢুকে, আরো সরু ফুটো দিয়ে বেরুচ্ছে বোধ হয়। খাড়া পাথরটা তো দেখছি ঝাঁঝরা !'

আস্তে আস্তে নৌকোটা দ্বীপের বাঁক ঘুরে অন্য পাশে পৌঁছে গেল। এদিকের পাড়টা উঁচু হলেও ছোট একটা ঝরনা পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে জলপ্রপাত হয়ে নীচে পড়ছে। সেখানে সরু একফালি বালি

দেখা যাচ্ছিল। পরিষ্কার ঝরঝরে।

নোটো বলল, 'ঐ দ্যাখ, আমাদের নৌকোর বন্দর আর জল-সরবরাহের বন্দোবস্ত! তোদের জলতেষ্টা পায়নি?' তাই শুনে ছোটদের চোখে জল, মুখে হাসি। পায়নি আবার! দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে। সূর্য কতটা উঠে গেছে। দুধ খায়নি, জল খায়নি।

মৌয়ের দিকে ফিরে নিমাই বলল, 'সব থেকে ভয় কিসের জানিস? বাঘ নয়, ভূত নয়, পরি নয়; সবচেয়ে ভয়ংকর হল ভয়ের ভয়। বড় মাস্টারমশাই বলেছেন।' ব্যস্, সব চুপ। বড় মাস্টারমশায়ের কথার ওপর কথা চলে না। সবাই তাঁর কথা শোনে। বিজয়ার দিন নানিও তাঁর পায়ের ধুলো নেয়।

জল ক্রমে কম গভীর হয়ে এল। এদিকে কাদা নেই। খালি বালি। নৌকো আস্তে আস্তে তীরে লাগল। অমনি কানে এল ঝরনার জল পড়ার শব্দ। ঝরনা এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। মাঝখানে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিপি মাথা তুলে রয়েছে।

নোটো বলল, 'নৌকো আড়ালে রাখতে হয়। এই দ্বীপে কেউ এলে, ঐ ঝরনার পাশের জায়গাটাতেই নামে নিশ্চয়। বোমারাও তাই করবে। যদি এতদূর পৌঁছয়। তবে বোমা সহজে এ-মুখো হবে না। ও বলে, হতে পারে দ্বীপে লোক নামে কিন্তু তারা যে ফেরে না, তাতে সন্দেহ নেই। নইলে দ্বীপে কী আছে কেউ জানে না কেন?'

লটকান শুনে অবাক হল, 'জানবে না কেন? ভূত আছে। পরি আছে।' এদের নোটো কী বোঝাবে? খালি বলল, 'ভুলুর দিদিমা তো বলেন আমাদের দুঃস্থ পশুরা কেউ সত্যি জানোয়ার নয়। বোবা, ঠ্যাং-মচকানো, কানা, বদমেজাজি মাজা-ভাঙা, একের পর এক জানোয়ার

একটা বন থেকে বেরিয়েছে বলে কেউ কখনো শুনেছে ? তা হলে দুঃস্থদের ঘরে জায়গা দিয়েছিলে কেন ? ভয় করেনি ?'

দুঃস্থদের আবার কেউ ভয় করবে, এমন অদ্ভুত কথা শুনলে কার না হাসি পায় ? ততক্ষণ নৌকো টেনে তুলে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নোটো বলল, 'চল। পাহাড়ে চড়া যাক। পথ আছে নিশ্চয়। তার আগে কেষ্টশিংকে একটু হাওয়া খাওয়াই।' এই বলে এক-শিং-ভাঙা গুবরেটাকে বের করে বালির ওপর ছেড়ে দিল। তারপর পকেট ঝেড়ে সাফ করে বলল, 'একমাত্র ওরই পরিফরির ভয় নেই। ওর আর আমার।'

নিমাই বলল, 'আর আমার।'

মৌ আর লটকান একসঙ্গে বলল, 'আমরা পরি ভয় পাই।' ন্যাড়া মুখে একটা বাতাসা পুরে একগাল হেসে বলল, 'আমিও ভয় পাই। পরি কামড়ায়।' তাতে সকলে খুব হেসে মন হাল্কা করে নিল। নোটো কেষ্টকে বালির ওপর একটু হাঁটিয়ে আবার পকেটে ভরল।

পাহাড় না চড়ে উপায় কী ? দ্বীপের মধ্যিখানটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু। সবটা মাঝারি গাছ দিয়ে ঢাকা। আতা, পেয়ারা, টোপাকুল, বেতগাছ, নিমগাছ, কাঁটাঝোপ, ফলসাগাছ, এই সব। বেশ ছায়া-ছায়া, সুন্দর। অনেক পেয়ারা পেকে আছে। কিন্তু পাহাড়-চড়া খুব সহজ কাজ নয়। পথ বলতে আসলে কিছু নেই। অসংখ্য ছোট হরিণ, গায়ে সাদা ফুটকি আর লাল চোখ সাদা খরগোশ গাছতলায় নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে। এতটুকু ভয় নেই। কিন্তু নড়াচড়া করলেই পাঁই পাঁই ছুট !

অনেক কষ্টে, লতা সরিয়ে, নিচু ডালপালার সাহায্য নিয়ে, হাঁচড়পাঁচড় করে, একটু একটু করে ওঠা। ভারী মজাও লাগে। পাকা পেয়ারা পেড়ে খেতে খেতে ওঠা। হরিণরা আগে আগে উঠছে। তাদের পায়ে পায়ে পথ হয়ে গেছে। খরগোশরা নেচে বেড়াচ্ছে। একটু কাছে যেতেই এক দৌড়ে মাটিতে খোঁড়া গর্তে ঢুকে পড়ছে। আবার চার হাত দূরে আরেকটা গর্ত দিয়ে মুণ্ডু বের করছে। চোখ চকচক করছে ; গোঁপ নাড়ছে ; মনে হল হাসছে।

খুব খাড়া নয় টিলাটা, তবু হাঁপ ধরে যায়। খিদেতেষ্টাও পায়। ঝরনার শব্দ আরো জোরে শোনায়। ওরা তার কাছে এসে পড়েছিল। নোটো বার বার সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল, 'মাটির তলাটা কিন্তু খরগোশরা ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। নানামুখী সুড়ঙ্গ, ঢুকবার গর্ত, বেরুবার গর্ত। শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার কত বন্দোবস্ত।'

এমন সুন্দর জানোয়ারেরও শত্রু থাকে, কী আশ্চর্য !

নিমাই বলল, 'আশ্চর্য কেন ? সেবার ভুলুর দিদিমা খরগোশ রান্না করে পাঠিয়েছিলেন, খাসনি তোরা ?' সত্যি খেয়েছিল। খরগোশ এনেছিল বোমার কোনো পলটনি বন্ধু। সকলের বাড়িতে দিয়েছিল। তা নানি রেগে গেল। বোমাকে বলল, 'তুই তো জানিস, আমি দু-পেয়ে জন্তু ছুঁই না, আর পাঁচটা খরগোশ আনলি পাঁচ বাড়ির জন্য !!' বোমা আকাশ থেকে পল, 'দু-পেয়ে কোথা পেলে, নানি ? খরগোশের তো চারটে পা, বেড়ালের মতো।' নানির কী রাগ, 'খরগোশের ক-টা পা তুই চেনাবি আমাকে ? দুটো পা, তাতে ভর দিয়ে লাফায়, আর বসে। অন্য দুটো হাত। তা দেখেও বুঝিস না ?'

মোট কথা নানি রাঁধেনি। মাংস, ডিম খায়ও না। দিদিমা চমৎকার দোপেঁয়াজা করে সকলের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন।

টিলার ওপরটা একেবারে চ্যাপ্টা নয়। বেশ কচ্ছপের পিঠের মতো গোল হয়ে এসেছে। এখানেও অনেক গাছ। বনের

মতো। মাঝে মাঝে ফাঁক। ঝরনাটা তারই একটু নীচে দিয়ে বয়ে এসে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে গেছে। ঐ-রকম একটা ফাঁকা জায়গায়, ঝরনার ধারে ওরা বসে পড়ল। গাছগুলোর লম্বা লম্বা পাতা ঝুলে আছে। তার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইলে সুন্দর একটা শব্দ হয়। কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া। ওরা ঝরনার জলে গা হাত মুখ পা ধুল। খালিপায়ে হাঁটে সবাই, জুতোটুতোর বালাই নেই। সঙ্গে শুকনো জামা ইজের গামছা ছিল। গা ধুয়ে তাই পরল। মৌ লটকান ময়লাগুলো কেচে রোদে মেলে দিল।

তারপর ঝুলি থেকে মুড়ির মোয়া, রাঙাআলুসেদ্ধ, আমসত্ত্ব এই সব বের করে খেল। বড্ড একা একা লাগছিল। এই নির্জন দ্বীপে মা-বাবাকে কোথায় পাবে? পরিরা যদি তাদের হরিণ করে দিয়েই থাকে, তাহলে তো চিনতেও পারবে না। আর মা-বাবারা জানেও না এরা তাদের ছেলেমেয়ে।

ভেবেও ওদের খুব কষ্ট হতে লাগল। মৌ লটকান বলতে লাগল, 'নোটোদা, নিমাইদা, তোমরা তো বড়। তোমরা তো ওপরের ক্লাসে পড়। তোমরা জানতে এখানে মা-বাবাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। পেলেও চিনতে পারা যাবে না। তবে কেন এখানে নিয়ে এলে? নানির মনে কত কষ্ট হয়েছে বলো তো! নানির মতো মা আছে আমাদের। আরো মা দিয়ে কী করব? আমাদের মা-বাবারা নিশ্চয় মরে গেছে। ছেলেমেয়ে ফেলে কারো মা-বাবা চলে যায়?'

সবাই মহা কান্না জুড়ল, 'চলো, নানির কাছে ফিরে যাই। নানি আমাদের মা।' ঠিক সেই সময় মাথার ওপর দু-বার চক্কর দিয়ে দাঁড়কাগটা একেবারে নোটোর কাঁধে নেমে বসল। নোটোর মুখটা হাঁ হয়ে গেল! তাই দেখে কান্নাটান্না ভুলে ওরা হেসে গড়াতে লাগল। হেঁড়ে গলায় দাঁড়কাগ বলল, 'কলা খাও, কলা খাও, কলা খাও।'

'কলা? কোথায় কলা?'

দাঁড়কাগ নোটোর কানটা আস্তে করে টেনে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'ওদিকে ওদিকে ওদিকে!' বলে ধড়ফড় করে উড়ে একটু দূরে একটা গাছে বসল। ওমা! বেঁটে একটা কলাগাছে, ছোট ছোট লালচে কলার কাঁদি ঝুলছে। সবাই মিলে পেট ভরে মিষ্টি কলা খেল। দাঁড়কাগও। তারপর সে উড়ে গেল। ঝুলিতে কলা ভরা হল।

ওরা সবাই আবার গোল হয়ে বসলে পর নোটো বলল, 'এখন তোমাদের আসল কথা বলার সময় হয়েছে। মনে আছে নববর্ষের সময় দাদুর খুব অসুখ করেছিল। দাদু ভেবেছিল বাঁচবে না। তাই একদিন বলেছিল। সেই কথাই এখন তোদের বলব। মন দিয়ে শোন্।'

ছবি : দেবাশিস দেব

*মৌমাছিদের নাচের নানারকম ভাব ও ভঙ্গি আছে। ওদের নাচ তিন রকমের—ব্রাউণ্ড ডান্স অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে নাচা, ওয়াগ ডান্স অর্থাৎ শুধু শরীর নাচানো আর সেকল্ ডান্স অর্থাৎ শরীর বাঁকিয়ে নাচা।*

ছবি : অহিভূষণ মালিক

আমার মামাতো বোন গৌরী সেদিন ভারী মজার কথা বলে গেল, আর সেইসঙ্গে দিয়ে গেল নতুন একটা ধাঁধা।

ধাঁধাটা নতুন, তবে প্রসঙ্গটা পুরনো।

সেই যে ডাক ও তার বিভাগের এক তরুণ কর্মীর গল্প শুনিয়েছিল ছোট্‌কা, সে কিনা টেলিগ্রামের বয়ানকেই ধাঁধা করে তুলেছিল, 'সেণ্ড মোর মানি'-কে একটা সাংকেতিক যোগ বানিয়ে, মনে পড়ছে? তা সেই গল্পটা শুনে গৌরীদের পাড়ার এক বুড়ো ভদ্রলোক নাকি দারুণ চটে গিয়েছেন। গৌরী যে একটু-আধটু ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামায়, ভদ্রলোক তা জানেন। এও জানেন যে, ছোট্‌কা গৌরীর আত্মীয়। তাই গৌরীকে এসে বলেছেন, "এসব হল এখনকার ছেলে-ছোকরাদের কথা। আরো টাকা চাই। আরো টাকা পাঠাও। এই জন্যেই এ-দেশের কিছু হবে না। তোমাদের ওই ভদ্রলোককে (মানে ছোটকাকে) বলো, এ-দেশের যা আর্থিক অবস্থা, তাতে প্রত্যেকের বলা উচিত, আরো টাকা জমাও। সঞ্চয় করো।"

শুধু এ-কথা বলেই শান্ত হননি ভদ্রলোক। এই শ্লোগান দিয়েও যে ছোট্‌কার শোনানো ধাঁধার মতোই একটা ধাঁধা তৈরি করা যায়, তারও নমুনা দিয়ে গিয়েছেন গৌরীর কাছে। তবে ছোটকার দেওয়া ধাঁধাটার একটাই উত্তর। এই ধাঁধার উত্তর নাকি চাররকম হতে পারে। সে হোক না, এক রকম উত্তর করে মেলাতে পারাটাও কম নয়।

এবারে সেই ধাঁধাটাই দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ প্রতি অক্ষরের বদলে একটা করে সংখ্যা বসিয়ে নীচের যোগফলটাকে একটা অঙ্কের চেহারা দাও। মনে রাখবে, একটি অক্ষরের ক্ষেত্রে যে-সংখ্যা ধরবে, তা অন্য অক্ষরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না—

```
  SAVE
+ MORE
------
 MONEY
```

চারটে সম্ভাব্য উত্তর অঙ্কটার। কিন্তু একটা করলেই হবে। চাররকমের উত্তর করে দেখাতে হবে না।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

বা সে যু ন ব

তৃতীয় ধাঁধা ॥ বন্ধনীর মধ্যে এমন শব্দ বসাও যাতে বন্ধনীর বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মিশে একটা অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয়, এবং বন্ধনীর বাইরে ডান দিকের শব্দের শুরুতে বসে আরেকটি নতুন শব্দ তৈরি হয়—

মণি(—)দানি

গতবারের উত্তর ॥ (১) প্রথমজন দৌড়েছে ১/১/২+১/২=২ কি.মি, দ্বিতীয় জন দৌড়েছে ১/৩+১/৩=২/৩ কি.মি, তৃতীয়জন ১/১২+১/৪=১/৩ কি.মি। মোট দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। (২) অভি(নব)রত্ন। (৩) মনসামঙ্গল।

সত্যসন্ধ

## শব্দ-সন্ধান

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ■ | ২ | ৩ | | ■ | ৪ |
| ৫ | | ■ | | ■ | ৬ | |
| | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| ■ | ৭ | | | | | ■ |
| ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ৮ | ■ | ৯ | ■ | ■ |
| ১০ | | | ■ | ১১ | | |

এবারের শব্দসন্ধানে তোমাদের পক্ষিসন্ধান করতে হবে। সংকেত অনুযায়ী ১১টা পাখি খুঁজে বার করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

সংকেত : পাশাপাশি : (২) লম্বা লেজওয়ালা বিদেশী পাখি। (৫) কোকিল। (৬) টিয়াপাখি। (৭) কোন্ পাখি শান্তির প্রতীক ? (১০) জলচর পাখি। (১১) প্রবাদ আছে, এই পাখি মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে।

উপর-নীচ : (১) গায়ক পাখিবিশেষ। (৩) কোন্ পাখি কাঠের শত্রু ? (৪) ছাতা-মাথায় কোন্ পাখি রে ? নাও মিলিয়ে আগে-পরে। (৮) একাধারে পাখি, ফুল ও যন্ত্র। (৯) নিশাচর পাখি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | ব | নী | ■ | শি | বি | কা |
| ষ্ণু | ■ | প | র | ব | ■ | ছি |
| শ | শী | ■ | ক্ষা | ■ | আ | ম |
| ■ | ক | বি | ক | ষ্ক | ণ | ■ |
| প | র | ■ | ব | ■ | ব | রা |
| ন্ন | ■ | র | চ | না | ■ | ম |
| গ | বা | ক্ষ | ■ | সা | র | দা |

## মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই একটা সিকি আর একটা দশ পয়সা। ব্যস, তাহলেই তুমি তৈরি, খেলা দেখাবার জন্য।

আসলে এ-খেলাটা প্রায় ম্যাজিকের মতো চমকপ্রদ। কিন্তু জাদুমন্ত্র লাগে না, সাধারণ বুদ্ধিরই ব্যাপার। ব্যাপারটা বেশ মজারও বটে। আগে খেলার বর্ণনাটা শোনো।

কোনো বন্ধুকে বলো, সে তোমাকে না জানিয়ে এক হাতে সিকি রাখুক, অন্য হাতে দশ পয়সাটি। এবার তুমি তাকে চমকে দিয়ে বলে দেবে, সে কোন্ হাতে সিকি রেখেছে, আর কোন্ হাতে দশ পয়সা। কী করে ? আরে বাবা, সেটাই তো মজার খেলা।

বন্ধু তোমাকে না জানিয়ে পয়সা দুটো দু-হাতে রাখুক। এবার তুমি তাকে বলো, ডান হাতে রাখা পয়সাটাকে ১৭ দিয়ে গুণ করতে। গুণ হল কি না প্রশ্ন করে জেনে নাও। না, গুণফল বলবে না। শুধু গুণ হয়েছে কিনা, সেটুকু বলবে। এইভাবে, পরে, বাঁ হাতের পয়সাটাকেও ১৭ দিয়ে গুণ করতে বলো। এবারও প্রশ্ন করে জেনে নাও, গুণ হয়েছে কিনা। শুধু লক্ষ করো, গুণের সময় কত লাগছে তার। যে-হাতের গুণের সময় বেশি লাগছে দেখবে, সে-হাতেই সিকি রয়েছে। অন্য হাতে দশ পয়সা। কেন ? তুমি নিজেই দ্যাখো না ২৫কে ১৭ দিয়ে গুণ করতে কত সময় লাগে। আর ১০কে ১৭ দিয়ে গুণ করা তো নস্যি। কী, দারুণ মজার খেলা নয় ? তবে যে খুব ভাল নামতা জানে, তাকে দেখানো বিপদ।

মজারু

## কিসের ফোটো

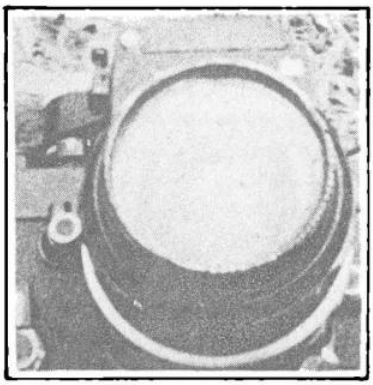

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্মের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

## উত্তর বটে

প্রঃ গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের মনে হাসছ কেন ?

উঃ ভাবছি পাগলা-গারদ খুলে ওরা যখন দেখবে আমি নেই, তখন কী মজাই হবে।

প্রঃ দশটা অঙ্ক দিয়েছিলাম, মাত্র একটা করেছ ?

উঃ কেন, একটা অঙ্কই তো দশবার করেছি, দশরকম উত্তর হয়েছে।

প্রঃ তোমার ঠাকুরদার বয়স কত হল ?

উঃ বলতে পারি না, তবে অনেকদিন ধরেই তাঁকে দেখছি।

প্রঃ জুতো পরে ঘুমোয় কারা ?

উঃ ঘোড়ারা।

প্রঃ শর্টহ্যাণ্ড জানো ?

উঃ জানি, সময় একটু বেশি লাগে।

সুসেন

## হাসিখুশি

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক হাতুড়ে ওষুধ বিক্রি করছিল, "এই ওষুধ খেলে মানুষের পরমায়ু তিনশো বছর বেড়ে যাবে। আমার বর্তমান বয়সই তো চারশো বছর।"

একজন পথচারী তাই শুনে হাতুড়ের যুবক-চেলাকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি, তোমার মনিবের বয়স চারশো বছর ?"

উদাস ভঙ্গিতে যুবকটি জবাব দিল, "তা কী করে বলব ? আমি তো ওঁর কাছে মাত্র দেড়শো বছর চাকরি করছি।"

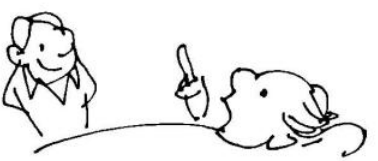

ধনী ব্যবসায়ী তাঁর মৃত্যুর সময় একমাত্র ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, "জীবনে উন্নতি করতে গেলে, সততা আর বুদ্ধিমত্তা—এ দুটি একান্ত জরুরি।"

"কীভাবে এদের কাজে লাগাব ?"

"কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তোমার হাজার অসুবিধা থাকলেও তা পালন করবে। এর নাম সততা।"

"আর বুদ্ধিমত্তা ?"

"কাউকে কখনও কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

কিশোর-ক্লাসিক

# দি অ্যাডভেঞ্চারস অব টম স্যয়ার

মার্ক টোয়েন

ভাষান্তর : **শেখর বসু**

পলিমাসি ভীষণ ভালমানুষ। তাঁর বোন মারা যাওয়ার পরে বোনের ছেলে টম স্যয়ারকে নিজের কাছে এনে রেখে দিয়েছেন তিনি। টম এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। সেন্ট পিটার্সবুর্গের স্কুলে পড়ে। তবে নামেই পড়া, দিনরাত্তির শুধু দুরন্তপনা করে বেড়ায়। আর, ওর মাথায় নানারকম ফন্দি ঘোরে সব সময়।

ছোট্ট গ্রাম পিটার্সবুর্গ ভারী সুন্দর দেখতে। শহরের প্রায় চারদিক ঘিরে রেখেছে ঘন সবুজ বন। সেই বনে আছে কয়েকটা ভাঙা বাড়ি। ছোটরা জানে, ওই সব বাড়িতে আছে গুপ্তধন। তবে ওখানে কারও যাওয়ার সাহস নেই। কেননা, পোড়োবাড়ি মানেই ভূতের আড্ডা। আর একদিকে আছে মস্ত একটা গুহা। ওই গুহায় ঢোকার রাস্তা সহজ। তবে বেশি ভেতরে ঢুকলে নাকি পথ চিনে আর বেরিয়ে আসা যায় না!

শহরের এক ধার দিয়ে মিসিসিপি নদী বয়ে গেছে। নদীতে অনেক স্টিম-বোট চলে। তীরে দাঁড়িয়ে ওই নৌকোগুলো দেখতে দারুণ মজা লাগে ছোটদের।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। টম সাত-সকালেই খেলতে বেরিয়ে গেছে। গেছে তো গেছেই, ফেরার আর নাম নেই। কোনো বিপদ হয়নি তো ছেলেটার! রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ভালমানুষ পলিমাসি। 'টম টম টম'—বেশ কয়েকবার চেঁচিয়ে ডাকার পরে হঠাৎ দেখলেন টম ঠিক তাঁর পেছনে। ওর হাতে-মুখে জ্যাম লেগে আছে। পলিমাসি ওর হাতটা চেপে ধরে বললেন, "বাঁদর ছেলে! কী করছিলি তুই ভাঁড়ারঘরে?"

টম একেবারে ভাল ছেলের মতো মুখ করে বলল, "কই, কিচ্ছু না তো!"

"কিচ্ছু না? দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি।"

কিন্তু তার আগে মাসিকেই মজা দেখাল টম। ভয়-পাওয়া গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, "মাসি, তোমার পেছনে ওটা কী?"

মাসি ভয় পেয়ে ওর হাত ছেড়ে পেছনে তাকাতেই চম্পট দিল টম। ভালমানুষ মাসিকে ঠকাবার জন্যে রোজ নতুন-নতুন কায়দা আবিষ্কার করত টম। এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

সেদিন সন্ধেয় রাস্তায় বেরিয়ে টম দেখল একটা ছেলে দারুণ সাজগোজ করেছে। ছেলেটার ডাঁটিয়ালের মতো চলাফেরা দেখে হঠাৎ ওর ওপর রাগ হয়ে গেল টমের। ছেলেটাকে ধরে পেটালে কেমন হয়? কিন্তু শুধু-শুধু তো কাউকে মারা যায় না। টম গায়ে পড়ে ছেলেটার সঙ্গে ঝগড়া বাধাল, তার

পথ ধরল।

রাত্তিরবেলা সোজা পথে ফেরা ঠিক হবে না ভেবে টম জানলা দিয়ে গলে ঘরে ঢুকল। কিন্তু ওর কপাল খারাপ, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পলিমাসি। টমের জামা-প্যান্ট, হাত-মুখের চেহারা দেখে মাসি বুঝতে পারলেন ছেলে কী কীর্তি করে ফিরেছে! ভীষণ চটে গিয়ে মাসি ঠিক করলেন, কাল টমকে শায়েস্তা করতেই হবে।

পরদিন শনিবার, টমদের ছুটির দিন। কিন্তু পলিমাসি টমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে বললেন, "আজ আর একদম খেলাধুলো নয়, তুমি বসে বসে বাড়ির সামনের বেড়াটা রঙ করবে।" তাই শুনে টমের মুখ শুকিয়ে গেল। ন ফুট চওড়া আর ত্রিশ গজ লম্বা বেড়া রঙ করতে তো সারা দিন লেগে যাবে। কিন্তু মাসির আদেশ অমান্য করার সাহস নেই ওর। রঙের কৌটো আর ব্রাশ নিয়ে কাজে বসে গেল টম। বেড়ার গায়ে একটুখানি রঙ টেনে চোখে জল এসে গেল ওর। ইশ্! এত সুন্দর ছুটির দিনে ও একবারও খেলতে যাওয়ার সুযোগ পাবে না!

বাড়ির কাজের ছেলে জিম হাতে বালতি ঝুলিয়ে দূরের পাম্প থেকে জল আনতে যাচ্ছিল। টম ওকে ডেকে বলল, "জিম, তুই একটু রঙ কর, আমি জল এনে দিচ্ছি।"

মাসির ভয়ে টমের কথায় রাজি হল না জিম। কিন্তু টম নাছোড়। বলল, "তুই যদি আমার হয়ে একটু রঙ করে দিস, আমি তোকে আমার সাদা মার্বেলটা দিয়ে দেব।" প্রস্তাবটা এতই লোভনীয় যে, রাজি হয়ে গেল জিম। টম ভাবল, যাক, এই ফাঁকে একটু খেলাধুলো করে আসা যাবে। কিন্তু টমের বরাত খারাপ, ঠিক সেই সময় একটু দূরে পলিমাসিকে দেখা গেল। মাসিকে দেখামাত্তর বালতি হাতে পাম্পের দিকে ছুট লাগাল জিম।

বেচারা টম! মনখারাপ করে ও বেড়ার গায়ে রঙ টানতে লাগল আস্তে আস্তে। একটু বাদে মস্ত একটা আপেল খেতে খেতে সেখানে এসে হাজির হল বেন রজার্স। বেন টমের প্রায় সমবয়সী। বেন ঠাট্টা করে টমকে বলল, "বেশ হয়েছে, ছুটির দিন বসে বসে এখন রঙ করো সারাদিন।"

টম অসম্ভব চালাক ছেলে। বেনকে দেখেই ওর মাথায় একটা মতলব খেলে গিয়েছিল। ও বিরাট এক শিল্পীর কায়দায় একটু করে রঙ লাগায় বেড়ায়, আর সরে গিয়ে তারিফ করার ভঙ্গিতে দেখে। তাই দেখে বেন ভাবল, বেড়া রঙ করাটা না জানি কী দারুণ একটা কাজ! ও টমকে বলল, "এই, আমাকে একটু রঙ করতে দিবি?"

বেন টোপ গিলেছে দেখে টম মনে মনে খুব খুশি হল, কিন্তু মুখে ভারিক্কি চাল ফুটিয়ে বলল, "পাগল! এ কাজ সবাই পারে না।"

তাই শুনে বেনের আগ্রহ বেড়ে গেল আরো। ও কাকুতি-মিনতি করে বলল, "একটুখানি রঙ করতে দে না আমাকে, আমি তোকে আমার আপেলটা দিয়ে দেব।" টম চোখেমুখে অনিচ্ছার ভাব ফুটিয়ে রাজি হল শেষে। বেন মহানন্দে চড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেড়া রঙ করতে শুরু করে দিল। ওদিকে গাছের ছায়ায় বসে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আপেল খেতে লাগল টম।

একই কায়দায় টম বোকা বানাল বিলি ফিশার, জনি মিলার এবং আরো অনেকগুলো ছেলেকে। বেড়া রঙ করার 'দুর্লভ' সুযোগ দেওয়ার জন্যে টম অনেক কিছু উপহার পেল। যেমন—ঘুড়ি, বারোটা মার্বেল, নীল কাঁচের টুকরো, চক, কুকুরের

কলার, ছুরির ভাঙা বাঁট, অকেজো চাবি ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখতে দেখতে তিন কোট রঙ পড়ে গেল অত বড় বেড়াটার গায়ে। কাজ শেষ হতেই বাহাদুরি নেবার জন্যে টম ছুটল মাসির কাছে।

এই গ্রামে হাকলবেরি ফিন নামে একটা অনাথ ছেলে আছে। টমের সঙ্গে তার খুব ভাব। একদিন দুই বন্ধু ঠিক করল, মাঝরাত্তিরে কবরখানায় যাবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। মাঝরাত্তিরে হাকের বেড়ালডাক শুনে জানলা টপকে বেরিয়ে এল টম। তারপর শুরু হল তাদের অ্যাডভেঞ্চার। মাঝরাত্তিরে নির্জন কবরখানায় পৌঁছে গা-ছমছম করতে শুরু করে দিল দুই বন্ধুর। চারদিকে বোধ হয় প্রেতাত্মারা গিজগিজ করছে। কিন্তু একটু বাদে প্রেতাত্মার বদলে তিনজন চেনা লোককে দেখতে পেল ওরা। একজন মাফ পটার, একজন ইন্‌জুন জো, আর একজন তরুণ ডাক্তার রবিনসন। ডাক্তার ওই দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কবরখানা থেকে মড়া চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু মড়া বার করার পরে সঙ্গী দুজন ডাক্তারকে বলল, "আরো পাঁচ টাকা দিতে হবে।"

ডাক্তার রেগে গিয়ে জানাল, সর টাকা সে আগেই দিয়ে দিয়েছে, আর এক পয়সাও দেবে না। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, তারপর মারামারি। ডাক্তার কফিনের ঢাকনা তুলে নিয়ে মাফ পটারের মাথায় মারল। পটার অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্‌জুন জো পটারের ছুরিটা বসিয়ে দিল ডাক্তারের বুকে।

খুব কাছে লুকিয়ে থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখল টম আর হাক। তারপর ওরা নিঃশব্দে ওখান থেকে পালাল। ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল দুজনের। ইন্‌জুন জো পয়লা নম্বরের গুণ্ডা। তার এই ছুরি মারার ঘটনাটা যদি কখনো ওদের মুখ ফসকে বার হয়, তাহলে ওদের আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। সুতরাং, দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করল, এই ব্যাপারে একেবারে মুখ খুলবে না। শেষ রাতে বাড়ি ফিরে এল টম। হাক গেল ওর এক বন্ধুর খামারবাড়িতে।

পরদিন সকালে সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেল ডাঃ রবিনসন খুন হয়েছে। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! মৃতদেহের পাশে মাফ পটারের ছুরি পড়ে আছে। পটার নিখোঁজ। পটারকে ধরার জন্যে শেরিফের লোক ছুটল চতুর্দিকে। শেষে ধরা পড়ল লোকটা। শেরিফ সেই রক্তমাখা ছুরিটা পটারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি তোমার ছুরি?"

ফ্যাকাশে মুখে পটার ঘাড় কাত করল একপাশে, তারপর ভেঙে পড়ে বলল, "বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি ডাক্তারকে খুন করিনি।"

শেরিফ সে কথায় কান না দিয়ে জেলে পাঠালেন পটারকে। তাই দেখে টম আর

হাক ভীষণ কষ্ট পেল। বেচারা তো একেবারেই নির্দোষ। দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক করল পটারকে বাঁচাবার জন্যে একটা কিছু করতেই হবে।

পটারের বিচারসভায় বেজায় ভিড়। আদালতের একপাশে টম আর হাক, আর একপাশে ইন্‌জুন জো। জোয়ের মুখটা ঠিক পাথরের মতো দেখাচ্ছিল।

বিচার যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে সবাই বুঝতে পারল, পটারের ফাঁসি হবেই হবে। এমন সময় সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাক পড়ল টমের। জোয়ের দিকে চোখ পড়তেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল টমের। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না, নির্দোষ লোকটাকে বাঁচাতেই হবে। টম ভয়ংকর সেই রাতের ঘটনাগুলো এক-এক করে জানানোর পরে বলল, "মাফ পটার মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জুন জো ছুরি নিয়ে—।"

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ইন্‌জুন জো আদালতের জানলা টপকে ছুটে পালাল তীরবেগে।

বিচারে বেকসুর খালাস হয়ে গেল মাফ পটার। নির্দোষ লোককে বাঁচাবার জন্যে সবাই ধন্য-ধন্য করল টমকে। তবে সমানে বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল দুই বন্ধুর। সুযোগ পেলে ইন্‌জুন জো এবার ওদের শেষ করে দেবে।

কয়েকদিনের মধ্যে গরমের ছুটি পড়ে গেল স্কুলে। ছুটিতে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা চেপে ধরল দুই বন্ধুকে। ঠিক হল, গুপ্তধনের সন্ধানে ওরা জঙ্গলে যাবে। জঙ্গলে বড় গাছের গোড়ায় কিংবা পোড়ো বাড়িতে গুপ্তধন আছে, একটু কষ্ট করে খুঁজে নিতে হবে—এই যা।

একদিন বেলচা কাঁধে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। তারপর কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরির পরে পছন্দসই একটা পোড়োবাড়ি পেয়ে গেল। বাড়িটার জীর্ণ দশা, দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু দুই বন্ধু অনেক কষ্ট করে দোতলায় উঠল। দোতলাটাও একতলার মতো ভাঙাচোরা।

ওরা যখন নামব-নামব করছে ঠিক তক্ষুনি একতলায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে? দুই বন্ধু কাঠের ফুটোয় চোখ রাখতেই ইন্‌জুন জো আর বোবা-কালা স্প্যানিয়ার্ডকে দেখতে পেল। দুজনে ফিসফিস করে কথা বলছিল। স্প্যানিয়ার্ডটা তাহলে সত্যি-সত্যি বোবা-কালা নয়! ওদের দেখে ভয়ে বুক উড়ে গেল দুই বন্ধুর।

জো আর স্প্যানিয়ার্ড মেক্সিকোয় পালিয়ে যাবার মতলব আঁটল। তবে এখন নয়, পরে। এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। দুজনেই ঘুমিয়ে নিল কিছুক্ষণ। ঘুম থেকে উঠে ঠিক করল ওদের টাকার থলিটা এখানে পুঁতে রেখে দেবে। তারপর কাল সকালে এসে ওটা নিয়ে পালিয়ে যাবে মেক্সিকোয়। ইন্‌জুন জো গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিল মেঝেতে। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পরে কিসে যেন ঠোক্কর খেল বেলচা। কী ওটা? আরে গুপ্তধন! একটা ক্ষয়ে-যাওয়া লোহার বাক্সভর্তি সোনার টাকা। হঠাৎ গুপ্তধন পেয়ে লোকদুটোর সে কী আনন্দ! কিন্তু এখন এটা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কাল ভোরে এসে গুপ্তধন নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে।

এমন সময় হঠাৎ শব্দ উঠল দোতলায়। চমকে উঠে নিজের ছুরিতে হাত রাখল জো। দোতলায় কে? ভয়ে বুক উড়ে গেল টম আর হাকের। ধরা পড়লেই মৃত্যু। স্প্যানিয়ার্ড হাসতে হাসতে বন্ধুকে বলল, এখানে আবার কে আসবে? নির্ঘাত ইঁদুর-টিদুর।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# ব্যাটে-বলে

## পঙ্কজ রায়

॥ ৮ ॥

হায়দরাবাদের ব্যর্থতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমার দৃষ্টির কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না। আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। টেস্টের আগে প্রয়োজনমাফিক অনুশীলন করতে পারিনি, তাই ...। আশ্চর্য! এই সত্যকে কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। দৃষ্টিশক্তি আর চশমাকে দোষারোপ করে চললেন সবাই। প্রাণপণে চেষ্টা করেও যখন কাউকে সংশয়মুক্ত করতে পারলাম না, আমার রাগ হয়ে গেল। কথায় কোনো জবাব না দিয়ে ব্যাটে জবাব দেব স্থির করলাম। একটা সেঞ্চুরি করে দেখাতে পারলে তার চাইতে ভাল জবাব আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু, দ্বিতীয় টেস্টে বাদ পড়ার ফলে আমাকে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকতে হল। এই বাদ পড়ার জন্য চুটিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ পেলাম আমি। তৃতীয় টেস্টেও ডাক পেলাম না। নবাগত বিজয় মেহেরা বোম্বাই ও দিল্লিতে ব্যর্থ হলেন। দিল্লিতে আর এক নবাগত নরি · কনট্রাক্টর ওপেনার হিসেবে ভালই খেললেন। প্রথম টেস্টের পর বাদ যাওয়ার সময়ে কেন জানি না মনে হয়েছিল, অন্তত আর একটা সুযোগ পাবই। চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দেবার আগে নির্বাচকরা 'হোম গ্রাউণ্ডে' মানে ইডেনে একবার আমাকে যাচাই করে দেখবেন। সেই আশায় আমি বুক বেঁধে বসে ছিলাম। আমার ধারণা চতুর্থ টেস্টে সত্য বলে প্রমাণিত হল। কলকাতায় খেলবার জন্য টেস্ট দলে আমাকে নেওয়া হল। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন—শেষ সুযোগ, তোমাকে ভাল করে খেলতে হবে। রান করতে হবে। নইলে কলকাতা টেস্টই হবে তোমার শেষ টেস্ট। একথা মনে রেখো।

কথাটা আমিও জানতাম। তাই আমার কর্তব্য দ্রুত স্থির করে নিয়েছিলাম। যেমন করে হোক, সেঞ্চুরি চাই। ইডেনে কিছুতেই খালি হাতে ফেরা চলবে না। অতি পরিচিত মাঠ, চেনা দর্শকদের সামনে ভাল খেলে টেস্ট দলে ফের নিজের জায়গা কায়েম করে নিতে হবে।

টসে জিতে উম্রিগড় ব্যাট করতে চাইলেন। পিচ একেবারে খারাপ ছিল না। তবু প্রথম ইনিংসে ভিনুভাই, আমি আর মামাসাহেব ঘোরপাড়ে ছাড়া আর কেউ সম্মানজনক রান করতে পারিনি। ভিনুভাই এবং কনট্রাক্টর; ইনিংসের সূচনা করেছিলেন। আমি ব্যাট করতে গিয়েছিলাম ওয়ান ডাউনে, অর্থাৎ তিন নম্বরে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান ছিল মামাসাহেবের, ৩৯। তারপর আমার ২৮, ভিনুভাইয়ের ২৫। স্পষ্ট মনে আছে, নরেন তামানে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য সে-ম্যাচে খেলতে পারেননি। বদলি হিসেবে সি টি

পাটানকরকে নেওয়া হয়েছিল। তিনিও দুই অঙ্কের রান করেছিলেন (১৩)। বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেউ ছয়ের বেশি করতে পারেননি। সুতরাং দলের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। মাত্র ১৩২ রানে ইনিংস শেষ। উত্তরে নিউজিল্যাণ্ড ভারতের বোলিংকে বেশ ঠেঙাল। ৩৩৬ রান করল ওরা। তার মধ্যে ছিল জন রীডের ১২০ রানের ঝলমলে ইনিংস।

দ্বিতীয় দফায় আমি আর রামচাঁদ সেঞ্চুরি করলাম। মঞ্জরেকার দুর্ভাগ্যবশত আউট হয়ে গেলেন ৯০ রানের মাথায়। ওই সময় আমার খেলা দেখে অনেকেই বলেছেন, অত্যন্ত ধীরগতির খেলা। তখন ধীরে খেলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। দুটো সমস্যা খুব বড় হয়ে উঠেছিল। প্রথম চিন্তা ছিল, কী করে দলে নিজের জায়গা ফিরে পাওয়া যায়। দুই, চশমা নেওয়ার জন্য যাঁরা আমার দৃষ্টিশক্তি ও ক্ষমতাকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তাঁদের মুখের মতো জবাব দিতে হবে। এই দুই সমস্যা আমার সমস্ত ভাবনাকে ঢেকে রেখেছিল। আগেই বলেছি, মুখে নয়, ব্যাটে জবাব দেব ঠিক করেছিলাম। ধীরে করা হলেও, সেঞ্চুরিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল। ফের দলে ফিরে এলাম। আর, কেউ আমাকে চশমা বা চোখ নিয়ে কোনো বিরক্তিকর প্রশ্ন করেননি।

মরসুমের শেষ টেস্টে নরি কনট্রাক্টরকে ব্যাটিং অর্ডারের নীচের দিকে নামিয়ে আনা হল। মাদরাজে চিপক স্টেডিয়ামে এ-খেলা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কী কারণে যেন চিপকে খেলা হল না। টেস্ট নির্ধারিত হল কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে। টসে পলি উম্রিগড় ফের জিতলেন এবং ভারত প্রথমে ব্যাট করল। এ-ম্যাচে আমি আর ভিনুভাই মিলে প্রথম উইকেটে বিশ্বরেকর্ড করেছিলাম। তেইশ বছর পরে আজও তা অম্লান রয়েছে। সে-রেকর্ড গড়ার গল্পই এখন তোমাদের বলব।

অন্যান্য টেস্টের মতো সেই টেস্টের প্রথম সকালেও প্রাতরাশের সময় সবাইকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। সবার মধ্যে চাপা টেনশান। টেবিলে টেবিলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। বাইরে ঝকঝকে রোদ। দু-দলের সদস্যদের আর এক দফা অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে চতুর্দিকে। আমিও টেনশনে ভুগছিলাম, অবশ্য সামান্যই। আগের টেস্টে শতরান করার ফলে আমার আত্মবিশ্বাস তখন উঁচু পর্দায় বাঁধা। টসে জিতে এসে পলি উম্রিগড় যখন বললেন—"গেট রেডি, প্যাড আপ", ঝটিতি কাজে নেমে গেলাম। সাজসজ্জা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই দেখি, তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভিনু মাঁকড়। "কেয়া পঙ্কজ, রেডি ?"

"ইয়েস, রেডি।"

"তব চলো।"

"হ্যাঁ, চলো।"

আমি আর ভিনু একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। উইকেটের দিকে যাওয়ার সময় আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, কোনো তাড়াহুড়ো নয়, ধীরেসুস্থে খেলব। বোম্বাইতে জেতার সুবাদে ভারত ১-০ ম্যাচে এগিয়ে ছিল। জিতলে তো ভালই, মাদরাজে ড্র করলেও সিরিজ আমাদের হাতে থাকছে। কেবল দেখতে হবে যেন না হারি। ওদের জেতার গরজ বেশি। আমাদের ব্যস্ততার কোনো প্রয়োজন নেই। উইকেট ছিল অপূর্ব। একেবারে ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ।। আমরা টুকটুক করে খুশিমতো ইনিংস গড়তে শুরু করলাম। নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক এইচ বি কেভ আমাদের জুটি ভাঙবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। দলের ছজনকে দিয়ে বল করালেন। কিন্তু আমরা অবিচ্ছিন্ন রইলাম। প্রাথমিক পর্বে কিছু সময় দেখেশুনে খেলার পর আমি রানসংগ্রহের দিকে নজর দিলাম।

অন্যদিকে ভিনু স্বচ্ছন্দে নিজের খেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তারপর একসময়ে দুদিক থেকে মার শুরু হল। পেসার বা স্পিনার কেউ বাদ গেল না। আগে আমার শতরান পূর্ণ হল। ভিনু তখন সেঞ্চুরির খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি সেঞ্চুরি পাওয়ার পর এগিয়ে এসে ভিনু স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন। "ওয়েল ডান, পঙ্কজ। কনগ্র্যাচুলেশন্স।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। এবার তোমার পালা। মনে হচ্ছে, তুমিও খুব শিগ্‌গির সেঞ্চুরি পেয়ে যাবে।"

"আমার তাই মনে হয়।"

মাঁকড় হাসতে হাসতে ক্রিজে ফিরে গেলেন। এবং খানিকক্ষণ পরেই তাঁর শতরান হয়ে গেল। আমার রান তখন একশো কুড়ি। এবার আমি ভিনুভাইকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এগিয়ে গেলাম। "চমৎকার খেলেছ তুমি। আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

ভিনু সত্যিই খুব ভাল খেলেছিলেন। দর্শকদের উত্তাল হাততালির উত্তরে ব্যাট তুলে ধরার সময় তিনি মৃদুভাবে মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। "সেঞ্চুরি তো হয়ে গেছে, এবার এসো, বেধড়ক ঠ্যাঙানো যাক।"

এ-ব্যাপারে অমত করার কোনো কারণ ছিল না। মনের সুখে আমরা নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের পেটাতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ এই আনন্দদায়ক কাজটা করা গেল না। আলো কমে আসছে। দিনের খেলা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। এই অবস্থায় আমরা ঝুঁকি নেওয়ার চিন্তা ত্যাগ করলাম। প্রথম দিনের শেষে ভারতের দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান অপরাজিত অবস্থায় প্যাভিলিয়নে ফিরে এল। দুশ্চিন্তার ছায়া নামল নিউজিল্যাণ্ড শিবিরে।

দ্বিতীয় দিনে রণমূর্তি ধরলেন ভিনু মাঁকড়। মারের ফুলঝুরি ছুটতে লাগল। দ্রুত দেড়শো রানের সীমা অতিক্রম করে গেলেন তিনি। আমি যখন দেড়শো করলাম ভিনু তখন আরও এগিয়ে গেছেন। অপরাজিতের আনন্দ নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। আহ্! খাবারগুলো খেতে তখন কী ভালই না লাগছিল! হঠাৎ কয়েকজন সাংবাদিক এসে জানালেন, প্রথম উইকেটে বিশ্বরেকর্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। চেষ্টা করলে হয়তো রেকর্ডটা ভেঙে ফেলা যাবে। আমরা যেন সতর্ক হয়ে খেলি। শুনে শরীরে রোমাঞ্চের ঢেউ বয়ে গেল। মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতির তরঙ্গ। বিশ্বরেকর্ডের কাছে পৌঁছে গেছি! কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

[ক্রমশ]

*ভিনু মাঁকড় (মারের ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন)*

# এমন উপহার ওদের দিন যা ওদের সাথেই স্বপ্ন দেখে বড় হয়

# চিলড্রেনস গিফট প্ল্যান ইউনিটস

আপনার ছেলেমেয়েদের ইউনিট কিনে দিন। ৫0 টাকা থেকে শুরু করে ১0 এর গুনিতকে যে কোন সংখ্যার আপনার খুশীমতন। তাদের ইউনিটের সাথে সাথেই তারা বড় হয়ে উঠবে, তাদের স্বপ্ন সত্যি হবে।

ছেলে বা মেয়ের বয়স ২১ হয়ে গেলেই বা মেয়েদের বয়স ১৮ হলেই হাতে আসবে এক থোক টাকা। আর ঠিক সেই সময়েই ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পড়ে মূলধনের।

আরো একটা বিস্ময় উপহার: নির্দিষ্ট কিছু দিন পর পর সৌভাগ্য লটারী তাদের সামনে এনে দেয় বামপার ক্যাশ পুরস্কার লাভের সুযোগ।

এটা একটা বাড়তি বোনাস। স্বপ্ন সত্যি হয় ইউনিটে

**ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া**

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)
প্রধান কার্যালয় : বোম্বাই ৪০০ ০২০
আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-১৩১১, ২৩-১৬৩৮, ২৩-৮৮১৮, ২২-৮৭১৫

## সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে

Sista's-UTI-080/83/BEN

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
পার্থিবকে নামাচ্ছে কেন ?
পার্থিবকে নামানো ঠিক হল না !
MOTORIST
হুঁশিয়ার !
এ কী ?
আরে এ তো হয়েই থাকে !
রয়, কাকে বাদ দেবে, তা নিয়ে আর তোমার চিন্তা রইল না !
কী যে বলো !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

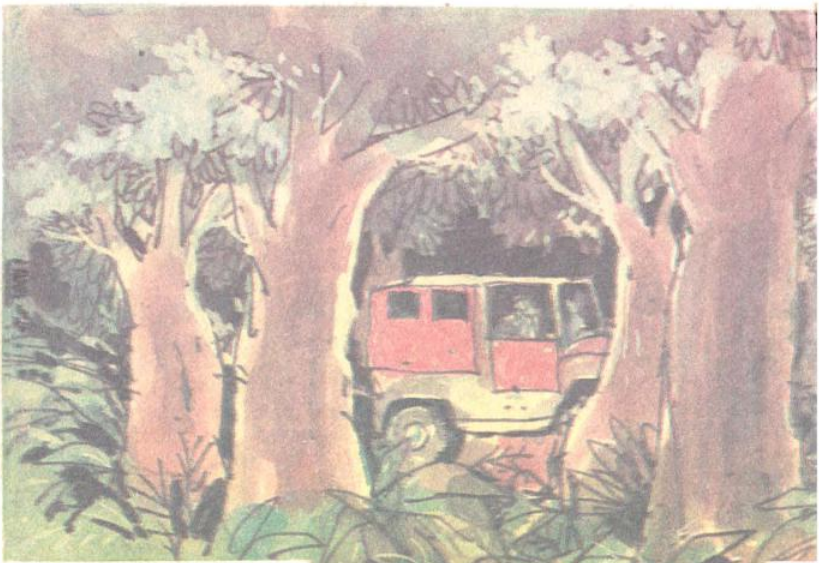

# শিম্বা-টাম্বো

## গীতা চৌধুরী

প্রবাদ আছে—'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।' কিন্তু যেখানে সিংহের ভয় সেখানে কী হয়? সন্ধে হয়, মোটর খারাপ হয় আর হয় রাত্রিবাস।

সিংহকে নিয়ে এরকম কোনো প্রবাদ আছে কি না আমার জানা নেই। তবে ঠিক এরকমই ঘটেছিল একজনের জীবনে। তিনি জাদুকর পি সি সরকার।

পি সি সরকারের পরিচয় তোমাদের কাছে নতুন করে দেওয়ার দরকার নেই নিশ্চয়ই। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমাণ। সারা জীবন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কত ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর 'ইন্দ্রজাল' জাদু। শেষে তাঁর মৃত্যুও হয়েছে ঐ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় জাপানের উত্তরতম দ্বীপ হোক্কাইডোতে। এত জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা তাঁর বেশ কয়েকখানা বইও আছে।

এক-একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে তিনি আমাদের কাছে সেই দেশের গল্প শোনাতেন। কত রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা তাঁর কাছ থেকে শুনতাম। তিনি আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর মুখে-শোনা গল্পগুলো আমাদের কাছে আজও জীবন্ত হয়ে আছে। তাঁর জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলো শুনলে মনে হবে পুরোটাই গল্প, কল্পকথা।

১৯৫৯ সাল। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরলেন তিনি।

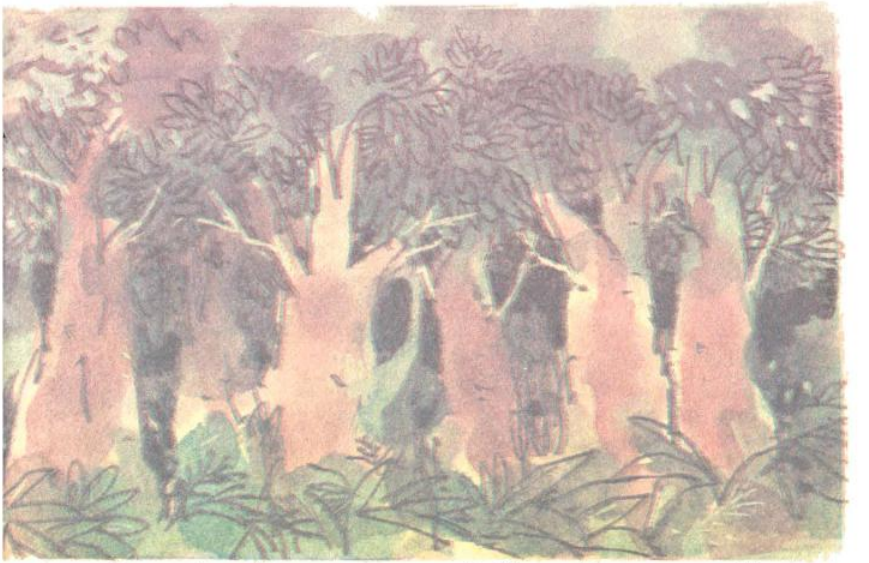

সেই ভ্রমণেরই একটি চমকপ্রদ গল্প আজ তোমাদের বলব।

টাঙ্গানাইকার রাজধানী ডারেসসালেম থেকে ৭৩০ মাইল দূরে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি শহরে যাচ্ছিলেন সদলবলে। আধা-মরুভূমি, আধা-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এই লম্বা রাস্তা অতিক্রম করতে দু-দিন লেগে যায়। তাই অর্ধেক পথ এসে আরুসা বা 'মোসি' শহরে হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়। এই অঞ্চলটা কিলিমঞ্জোরো পর্বতের পাদদেশে এবং 'সামে' অঞ্চলের সরকার-সংরক্ষিত বনভূমির মধ্যে। এলাকাটা বিখ্যাত নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের জন্য। হিংস্র বাঘ, শুয়োর, বুনো মোষই শুধু নয়—হাতি, গণ্ডার, সিংহ ইত্যাদি জানোয়ারের বিচরণভূমি।

শুনেছি টাঙ্গানাইকার আরুসা-মোসি অঞ্চলের সংরক্ষিত বনে এসে আমেরিকার একটি ফিল্ম কোম্পানি জন্তু-জানোয়ারের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। সংরক্ষিত অঞ্চলে শিকার নিষিদ্ধ। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। চার্লি চ্যাপলিন একবার সেখানে গিয়েছিলেন। অভিনেতা রবার্ট টেইলর-এর ছবি 'এডামসন ইন আফ্রিকা' এই জঙ্গলেই তোলা।

ইন্দ্রজালের দলবল স্টেশন-ওয়াগন চড়ে সন্ধে সাতটার পরে সামে সরকারের রিজার্ভ ফরেস্টের ঠিক মাঝখানে যেই না এসেছে, গাড়ির স্পিড গেল কমে। তারপর শেষবারের মতো গলাখাঁকারি দিয়ে একেবারে চুপ। গাড়ি গেল একদম বিগড়ে। অনেক চেষ্টা করেও গাড়ি একচুলও নড়ল না। সর্বনাশ! এখন উপায়? তোমরা কল্পনা করতে পারছ? ঐ ভয়াবহ জঙ্গলের মধ্যে বিকল গাড়িতে অসহায় যাত্রী! সামনে লম্বা রাত। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা হল গাড়ির গলদটা কী? ড্রাইভার অম্লানবদনে জানালেন, তেল নেই, গাড়ি চলবে না।

# সাধনা দর্শন

## একটি আদর্শ দাঁতের মাজন

দাঁত ও মাড়ির সকল ব্যাধি দূর করে ও দাঁত মুক্তার মত স্বচ্ছ ও সুন্দর করে!

**সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা**

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

**অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,**
এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন) এম. সি. এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

প্রধান কার্য্যালয় :
২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

তার মানে ? গাড়িতে কতটা তেল আছে তা না দেখেই ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে এতটা পথ এলেন ? কিন্তু সে তো গেল রাগের কথা। এখন উপায় কী হবে ? এই বন্যজন্তুর আস্তানায় অসহায়ভাবে জাদুকর ও তাঁর দলের সবাইকে রাত কাটাতে হবে ! গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল সবার। এ যে ভীষণ বিপদ ! এই অঞ্চলের পরিধি এদিকে ৬০ মাইল, ওদিকে ৫০ মাইল। দুদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। এর মধ্যে কোনো পেট্রল-স্টেশন নেই। শুধু আছে পি ডব্লু ডি ইঞ্জিনিয়ারদের থাকার জন্য জনমানবশূন্য রেস্ট-হাউস। এখন একমাত্র ভরসা যদি সামনে বা পেছন থেকে কোনো গাড়ি আসে। এলে সেই গাড়ির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। তবে সম্ভাবনা নেই, কেননা সে-পথে নাকি সন্ধ্যার পরে কোনো গাড়ি চলে না।

জাদুকর হঠাৎ বেশ ভাবপ্রবণ হয়ে বললেন, "কারও বাড়ি থেকে তো আর আমার মতো মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম আসেনি যে, তাঁরা বেপরোয়া হয়ে সন্ধেবেলা বন অতিক্রম করবে।"

এই প্রসঙ্গে বলি, কলকাতা থেকে তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুসংবাদের জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েই জাদুসম্রাট তাড়াতাড়ি দলবলসহ ফিরে আসছিলেন।

গুরুতর পরিস্থিতি ! ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। ড্রাইভারকে অনুরোধ করা হল গাড়ির অন্য কোনো গলদ নেই তো ! একবার নেমে দেখলে হয় না ?

প্রস্তাব শুনে ড্রাইভারের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি চেক করতে যাওয়ার অর্থ তো মৃত্যুর মুখে পা দেওয়া। ড্রাইভার বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'শিম্বা' 'টাম্বো'। অর্থাৎ সিংহ, হাতি। আফ্রিকার স্থানীয় ভাষায় সিংহ ও হাতি হল শিম্বা ও টাম্বো। ড্রাইভার আফ্রিকান, তিনি নিজের দেশের জঙ্গলকে ভালভাবেই চেনেন। ওই এলাকায় সিংহের উৎপাত এত বেশি যে, রেললাইন তৈরি করার সময় বহু লোক সিংহের পেটে গিয়েছিল—এ খবর তো সবারই জানা। 'চাঁদের পাহাড়' যারা পড়েছ আফ্রিকার সিংহের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে ভালভাবেই।

দলপতি সবাইকে সাহস দিতে লাগলেন। গাড়ির কাঁচের দরজা-জানলা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে টুঁ শব্দটি না করে চুপ করে বসে থাকাই ঠিক হল। এর আগে সরকারের প্রচারিত সতর্কবাণী পড়ে জাদুকর জেনে নিয়েছিলেন যে, গাড়ির আলো না জ্বালালে, হর্ন বাজিয়ে বিরক্ত না করলে, বুনো হাতি, গণ্ডার বা সিংহ সাধারণত আক্রমণ করে না। ঠিক হল কোনো জানোয়ার এসে গাড়িতে ধাক্কা মারলেও চুপ করে থাকা হবে।

রাত বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। চারদিকে জন্তু জানোয়ারের দাপাদাপি, চেঁচামেচি। যেন ওদের হাট বসেছে। এ হাটে মানুষ অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী। জানাজানি হলে নিশ্চিত মৃত্যু। গাড়ির চারপাশে হাতির ডাক, হরিণের ডাক, সিংহের গর্জন, আরও কত রকমের উদ্ভট শব্দ। জাদুকরের দলবল গাড়ির মধ্যে চুপ করে বসে ছিলেন।

তারপর ? ক্রমে বিপদের রাত্রি কেটে গেল। সূর্য উঠল। মনের সাহস ফিরে এল আবার। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি চেক্ করে এসে জানালেন, তেল আছে, তবে ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গেছে। সেটা মেরামত হওয়ার পরে গাড়ি ছুটল নাইরোবির দিকে।

দারুণ অ্যাডভেঞ্চার ! সুদূর আফ্রিকার গভীর অরণ্যে কয়েকজন বঙ্গসন্তানের এই ভয়ংকর রাত্রিবাসের কথা তোমরাও কি সহজে ভুলতে পারবে ?

---

ছবি : দেবাশিস দেব

ছেড়ে দাও আমাকে !
ধরে থাকো, উলফ !
গুড়ুম !
আর্থ টু মুন-রকেট...কী হল ? 'গুড়ুম' করে শব্দটা হল কিসের ?
মারা গেছে !
মুন রকেট টু আর্থ...ভয়ঙ্কর ব্যাপার...জর্গেন আমাদের আক্রমণ করেছিল...উলফ্ ঠেকায়...ধস্তাধস্তির সময় পিস্তল ছুটে গিয়ে জর্গেন মারা গেছে !
দোষ আমার নয়...মানে...আমি তো ওকে...
ঠিক আছে, ওসব...তুমি এখন আমাদেরই একজন !
না না, ওকে ক্ষমা করা ঠিক হবে না ! ও বিশ্বাসঘাতক ! এবারে ওকে লোহার বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব !!
এ কী, দম আটকে আসছে কেন ?
কার্বন ডায়োক্সাইড ! উত্তেজিত হোয়ো না ক্যাপ্টেন !
শান্ত হও !
তা হচ্ছি । কিন্তু ওই নচ্ছার সম্পর্কে সাবধান !
আরে ভেবো না ! বরং শুয়ে থাকো, তাতে অক্সিজেন বাঁচবে ।
তার আগে মানিকজোড়কে মুক্ত করা দরকার !...জর্গেনের মৃতদেহটার কীগতি হবে?
মহাশূন্যে ভাসিয়ে দেব ।
মিনিট কয়েক বাদে...
আর্থ টু মুন-রকেট...পৃথিবী থেকে তোমরা এখন ৩১ হাজার মাইল দূরে...খবর কী ?
মুন-রকেট টু আর্থ...কার্বন ডায়োক্সাইডের জন্য নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...
যে যার বাঙ্কে ঝিমুচ্ছে...আমারও ঘুম পাচ্ছে...
আর্থ টু মুন-রকেট...তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো...রকেট ঘোরাবার সময় এলে জাগিয়ে দেব ।
সময় কাটছে...
সবাই ঘুমোচ্ছে...এই সুযোগ...
কেউ জেগে না ওঠে !
কোথায় যাচ্ছ উলফ্ ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

# রিয়া...

...সতেজ সুন্দর অনুভূতি!

মনোরম সৌরভে
ফুল রিয়া
আর লেবু রিয়া

| ফুল রিয়া | লেবু রিয়া |
|---|---|
| কোমল ও মৃদু! | শীতল ও তরতাজা |
| সৌখিন গোলাপী | করা! চন্‌মনে |
| সাবান ফুলের হাল্‌কা | সবুজ সাবান লেবুর |
| সৌরভে! | লোভনীয় সৌরভে! |

টাটার তৈরী **রিয়া সুরভিত সাবান**

CASTR-8-172 BEN

# বাগানের রাজা

বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগানেতে বিলটুটা যতবার যায়—
হামাগুড়ি দিতে দেখে কটা বোলতায়,
পেয়ারার গাছে দেখে শালিখের বাসা,
ডিমগুলো পেড়ে খায় গিরগিটি খাসা।
শুকনো শকুনগুলো ডানা ঝাপটায়,
অবাক কাকের চোখে ছায়া চমকায়।
বিলটুটা দুটো হাতে তুলে নেয় ফুল,
মৌমাছি চাকে বসে কত নির্ভুল।
বুড়োদার টাকে বসে ডানাওলা পোকা,
বিলটুর মামা ডাকে, আয় না রে খোকা,
কিছু গাছ পুঁতে দিয়ে বাগানটা সাজা—
পারিস হয়েও যেতে বাগানের রাজা।

ছবি : দেবাশিস দেব

উপন্যাস

# লুকানো সোনা

অশোক বসু

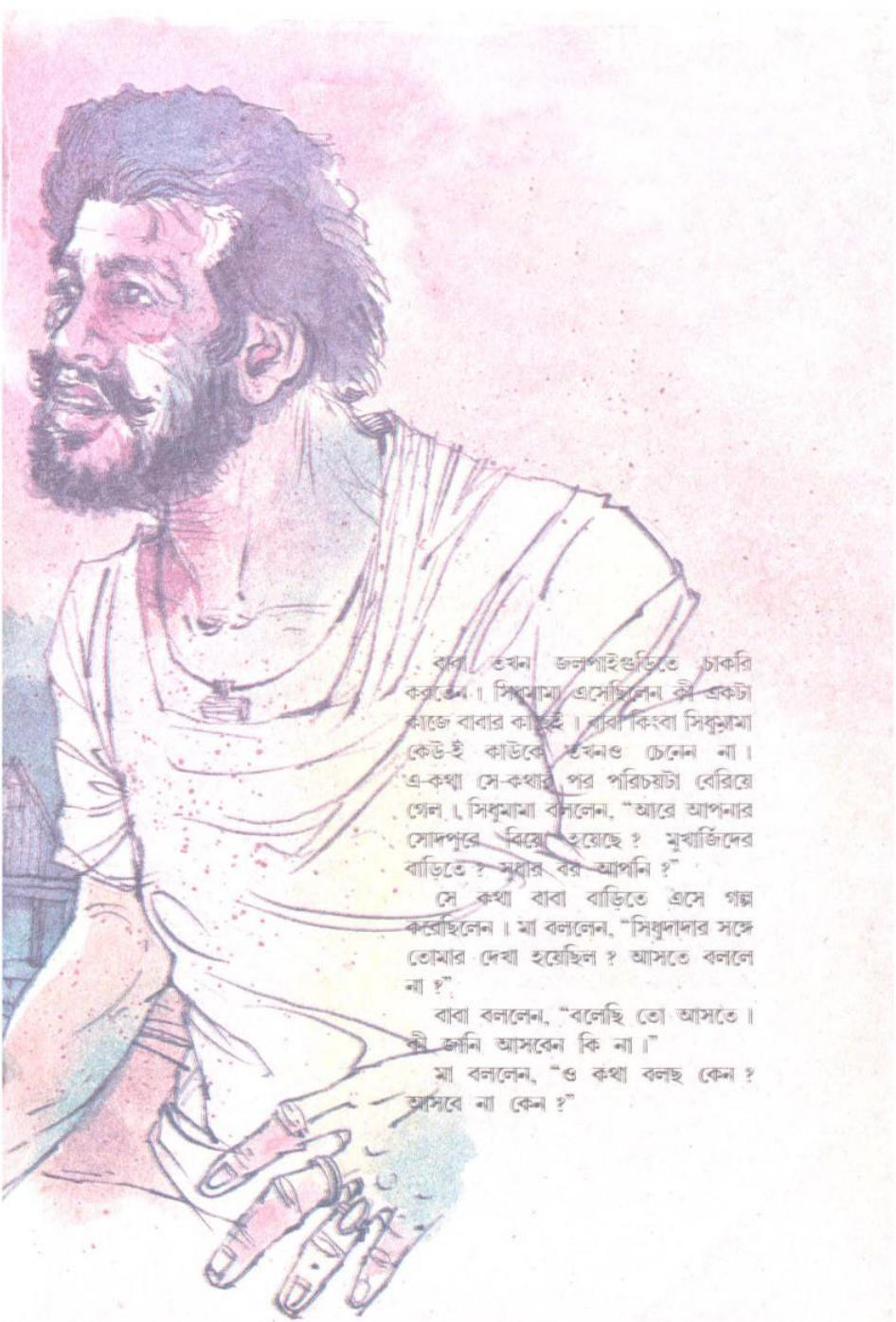

বাবা তখন জলপাইগুড়িতে চাকরি করতেন। সিধুমামা এসেছিলেন কী একটা কাজে বাবার কাছেই। বাবা কিংবা সিধুমামা কেউ-ই কাউকে তখনও চেনেন না। এ-কথা সে-কথার পর পরিচয়টা বেরিয়ে গেল। সিধুমামা বললেন, "আরে আপনার সোদপুরে বিয়ে হয়েছে? মুখার্জিদের বাড়িতে? সুধার বর আপনি?"

সে কথা বাবা বাড়িতে এসে গল্প করেছিলেন। মা বললেন, "সিধুদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? আসতে বললে না?"

বাবা বললেন, "বলেছি তো আসতে। কী জানি আসবেন কি না।"

মা বললেন, "ও কথা বলছ কেন? আসবে না কেন?"

বাবা বললেন, "আসবেন না সে-কথা বলছি না। কিন্তু ভদ্রলোককে কেমন-কেমন যেন মনে হল। আপনভোলা টাইপের একটু।"

মা হাসলেন। বললেন, "দাদা ওই রকমই। বরাবর বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। কতবার যে বাড়ি থেকে চলে গেছে কাউকে না বলে। বাইরে থেকে লোকটাকে ঠিক চেনা যায় না।"

বাবা বললেন, "এখন তো ঘরসংসার করে আছেন শিলিগুড়িতে।"

মা অবাক হয়ে বললেন, "দাদা তাহলে বিয়ে করেছে এতদিনে!"

বাবা বললেন, "তাই তো বললেন।"

মা বললেন, "চলো না, আমরাই বরং একদিন শিলিগুড়িতে যাই। দেখা করে আসি।"

বাবা বললেন, "শিলিগুড়িতে গিয়ে কী করবে? শিলিগুড়িতে তো তোমার দাদার বউ-মেয়ে থাকে। নিজে থাকেন না।"

"নিজে থাকে না?"

"না।"

"নিজে কোথায় থাকে?"

"রাজগঞ্জে আনারস-বাগান করেছেন, সেখানেই থাকেন। ওই আনারস-বাগানের ব্যাপারেই আমার অফিসে এসেছিলেন। তোমায় যেতে হলে সেখানেই যেতে হবে। কোন্ না কোন্ জায়গা, চিনিও না।"

কিন্তু আমাদের আনারস-বাগানে যেতে হল না, দু-দিন পরে সিধুমামা নিজেই এলেন আমাদের বাড়িতে। মাকে বললেন, "কী রে কেমন আছিস? চিনতে পারছিস তো?"

মা বললেন, "না বললে সত্যিই চিনতে পারতাম না। কতদিন পরে দেখলাম। চেনাই যায় না।"

মা'র কথা শুনে সিধুমামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। এত জোরে হাসলেন যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি চমকে উঠলাম।

ওই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই সিধুমামাকে আমার চেনা হয়ে গেল। আমাদের চেনাশোনা জগতের বাইরের মানুষ এই সিধুমামা।

সিধুমামার চেহারা বিশাল। গায়ের রঙ ঘোর কালো, এক মুখ কালো দাড়ি। আমি কখনও কাপালিক দেখিনি। তবু মনে হল সিধুমামাকে লাল কাপড় পরিয়ে কপালে লাল সিঁদুরের টিপ এঁকে দিলে বোধহয় কাপালিকের মতো দেখাবে। 'করাল কাপালিক' বলে আমার কাছে একটা গল্পের বই আছে। ওই বইয়ের মলাটে এই রকম একটা কাপালিকের ছবি আছে। আমার মনে আছে প্রথম দিন আমি সিধুমামার ধারেকাছে ঘেঁষিনি। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। অথচ মা'র কাছে সিধুমামার অদ্ভুত জীবনের গল্প শুনে মনে মনে ভারী লোভ হয়েছিল মানুষটার সঙ্গে মিশতে, তার রোমাঞ্চকর জীবনের কথা শুনতে। পরে অবিশ্যি ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তখন সিধুমামা বাড়িতে এলেই আমি কাছে কাছে ঘুরঘুর করতাম। সিধুমামা থাবা দিয়ে আমার একটা হাত ধরে বলতেন, "চল্ তপু, একদিন আমার ওখান থেকে ঘুরে আসবি। খুব ভাল লাগবে।"

আমি বলতাম, "কী আছে আপনার ওখানে?"

"আমার ওখানে? আনারস-বাগান আছে। বুঝলি কিনা, মাইলের পর মাইল আনারস-বাগান। সবটাই অবশ্য আমার নয়। আর বাগানের পেছনে বিরাট জঙ্গল আছে। জঙ্গলে হাতি আছে, বাঘ আছে। এ পাশে নদী। নদীর ধারে শ্মশান। রাত্তিরে শেয়াল ডাকে।" বলেই গোল গোল চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

মা বললেন, "আমরাই বরং একদিন শিলিগুড়ি যাব। তুমি তো একদিনও বউদিকে আনলে না।"

সে-সময় সিধুমামা কেমন যেন

অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। বললেন, "অ্যাঁ! কী বললে?"

"বউদিকে তো আনলে না।"

"বউদি? ওরা আছে ওদের মতো। মা আর মেয়ে। আমার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়। মাসে একবার। টাকা-পয়সা দিয়ে আসি। ওরাও আমার কাছে এর বেশি কিছু চায় না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধুমামা বললেন, "নেহাত শেষ সময়ে মাকে কথা দিয়েছিলাম বলেই বিয়েটা করা। আমি ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে মানুষ। ঘর-সংসার করা কি আমার কাজ! তা যেও, যেও একদিন। দেখা করে এসো।"

কিন্তু আমাদের শিলিগুড়িও যাওয়া হয়নি, সিধুমামার আনারস-বাগানও দেখা হয়নি। সিধুমামার সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিন মাস পরেই বাবা আবার বদলি হয়ে গেলেন। আমরা কলকাতা চলে এলাম।

এই যে সিধুমামার কথা বলছি, আসলে ছোটমামা কিংবা মেজমামার মতো সরাসরি কোনো মামা নয়। মা'র কীরকম ভাই যেন। সম্পর্কটা লতায়-পাতায়। সোদপুরে আমাদের মামার বাড়ির কাছে এককালে থাকতেন। আত্মীয়তা অনেক দূরের হলেও সিধুমামা আমাদের খুব কাছের লোক ছিলেন। জলপাইগুড়িতে থাকবার সময়ই কয়েকবার আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসার জন্যেই সম্পর্কটা অনেক কাছের হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন এই সিধুমামা। অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে শিলিগুড়িতে থিতু হয়েছিলেন, বাড়ি করেছিলেন, কিন্তু নিজে সে বাড়িতে থাকতেন না। সে বাড়িতে থাকতেন মামার স্ত্রী মানে মামিমা আর সিধুমামার একমাত্র মেয়ে। নিজে জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ির মাঝামাঝি কোনো জায়গায় জমি কিনে বিরাট আনারস-বাগান করেছিলেন। সেই আনারস-বাগানেই কাঠের বাড়ি করে থাকতেন। আসলে মানুষটা নিজের মধ্যে নিজে থাকতেই ভালবাসতেন।

জঙ্গলের ধারে নির্জন আনারস-বাগান। এক পাশে নদী। নদীর ধারে শ্মশান। শ্মশানে জোনাকপোকা জ্বলত-নিবত, শেয়াল ডাকত, ঝিঁঝি ডাকত। জঙ্গলের বিশাল-বিশাল গাছগুলো রাত্রির অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। চারধার শুনশান। সিধুমামা তাঁর কাঠের ঘরে সারারাত্রি একা-একা বসে থেকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে। হঠাৎ খোলা জানলার পাশ থেকে একটা মুখ সাঁত্ করে সরে যায়। সিধুমামা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে আসেন। বাইরে এসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে কাউকে খোঁজেন। তারপর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে যান নীচের অন্ধকারে।

এ-সব অবশ্য আমার দেখা কোনো জিনিস নয়। আমি মনে মনে এ-রকম কোনো ঘটনার সঙ্গে সিধুমামাকে মিলিয়ে নিতাম। তখনও আমি রাজগঞ্জ যাইনি, আনারস-বাগানও দেখিনি। আমি এ-সব কথা কল্পনা করতাম শুধু। খুব ইচ্ছে ছিল সত্যি-সত্যিই একদিন রাজগঞ্জ গিয়ে এক রাত্রি সিধুমামার বাড়িতে গিয়ে থাকব। তখন হয়তো আমার মনে-মনে আঁকা ছবিটা ঠিকঠিক মিলে যাবে।

যেতামও হয়তো, কিন্তু তার আগেই বাবার বদলির অর্ডার এসে গেল।

॥ ২ ॥

কলকাতায় আসার সাত মাস পরেই সিধুমামার চিঠি পেলাম। আমাকেই লিখেছেন। এর আগে মাকে কিংবা বাবাকে একটা-আধটা চিঠি লিখেছেন সিধুমামা, কিন্তু এ-চিঠি শুধু আমাকেই। লিখেছেন: তপু, তোমার তো ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তো তোমার সামনে অনেক

সময়। চলে এসো আমার এখানে। কেন যেন মনে হচ্ছে কবে আছি কবে নেই। তার আগে তোমাকে একবার আমার বাগান দেখিয়ে দিই। তুমি অনেকদিন বলেছ। এবার চলে এসো।

এই বয়সটাই তো অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময়। আর ঘরে বসে থাকলে তো অভিজ্ঞতা হয় না। অনায়াসে যা অর্জন করা যায় তার নাম অভিজ্ঞতা নয়।

যদি আসো, তবে আগে চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দেবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গাড়ি নিয়ে আমি অপেক্ষা করব। দার্জিলিং মেলে সোজা চলে আসবে। মনে রাখবে এখন থেকেই তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।

চিঠি পেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। এবার সত্যি সত্যিই সিধুমামার আনারস বাগানে যাব।

মা বললেন, "একা-একা কেমন করে যাবি? সে তো অনেক দূর!"

অফিস থেকে ফিরে এসে বাবা চিঠি পড়ে বললেন, "বাহ্! তোমার দাদা তো বেশ লিখেছেন।"

মা বললেন, "দাদা কত দেশ ঘুরেছে, কত মানুষের সঙ্গে মিশেছে। একটু-আধটু জানবে বৈকি।"

বাবা বললেন, "যাক তপু ঘুরে আসুক।"

মা'র ইচ্ছে নেই আমাকে একা-একা পাঠানোর। বললেন, "কিন্তু একা-একা তপু কি যেতে পারবে?"

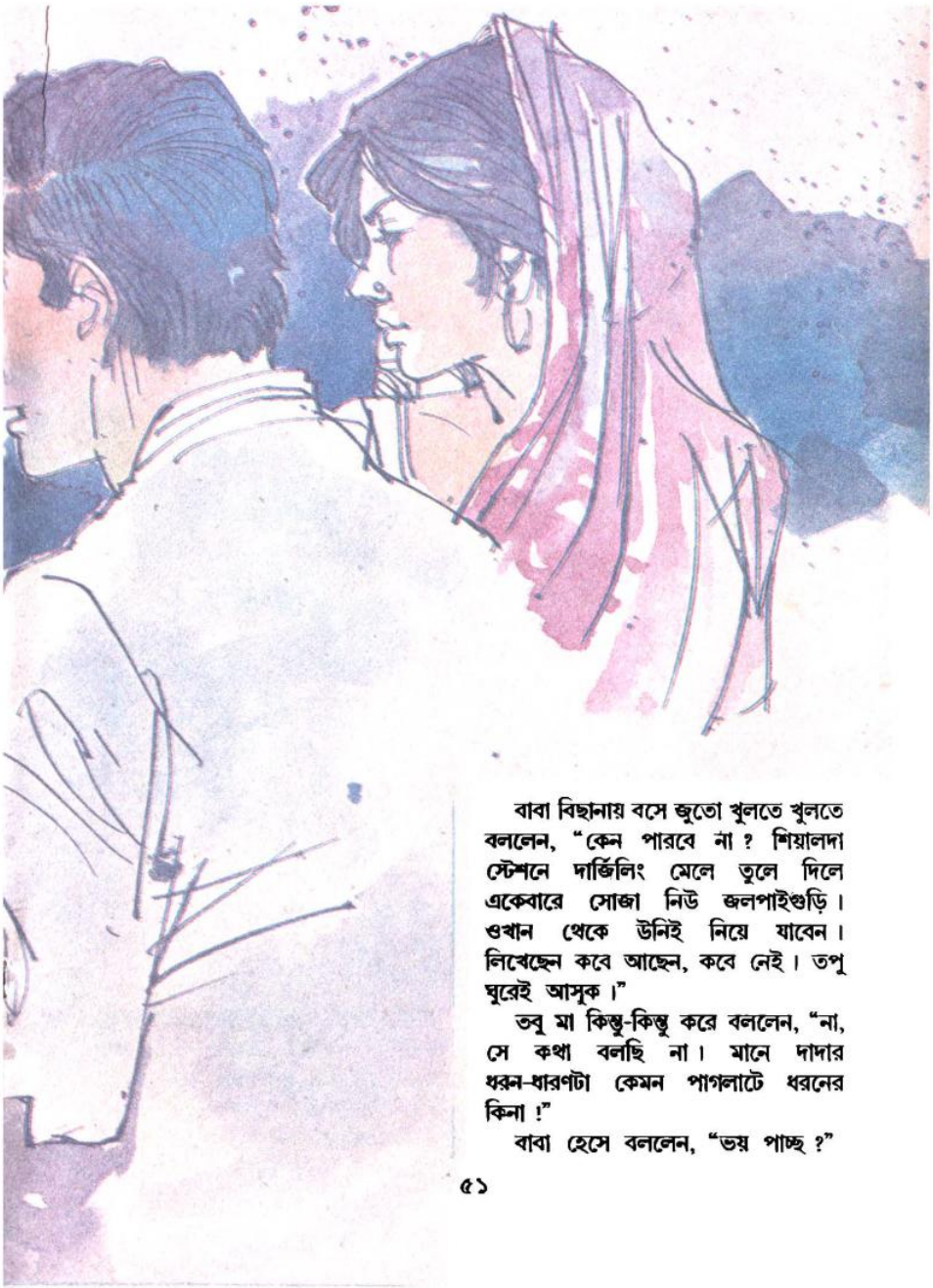

বাবা বিছানায় বসে জুতো খুলতে খুলতে বললেন, "কেন পারবে না ? শিয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিং মেলে তুলে দিলে একেবারে সোজা নিউ জলপাইগুড়ি। ওখান থেকে উনিই নিয়ে যাবেন। লিখেছেন কবে আছেন, কবে নেই। তপু ঘুরেই আসুক।"

তবু মা কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, "না, সে কথা বলছি না। মানে দাদার ধরন-ধারণটা কেমন পাগলাটে ধরনের কিনা !"

বাবা হেসে বললেন, "ভয় পাচ্ছ ?"

মা লজ্জিত হয়ে বললেন, "ভয় পাব কেন ? ভয় পাবার কী আছে ? মানে গ্রামগঞ্জ জায়গা, তো, তপুর হয়তো ভাল লাগবে না।" বলেই মা আমার দিকে তাকালেন।

আমার চোখের সামনে তখন ভাসছিল ছোট্ট একটুকরো ভূখণ্ড। পেছনে গহন জঙ্গল, এপাশে তিরতিরে নদী, আনারস বাগান। সব ছাড়িয়ে বহুদূরে পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে মেঘ। গভীর জঙ্গলে ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকি জ্বলে রাত্তিরে। নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় চিতাবাঘ, ভয় পেয়ে ছুটে যায় হরিণ। মাঝে-মাঝে হাতির পাল নেমে আসে আদিবাসী বস্তিতে ভুট্টা আর ধানের লোভে।

এমন জায়গার কথা সিধুমামার মুখে বারবার শুনেছি। এমন জায়গা যেন নিশির মতো ডাকছিল আমাকে। মা'র কথা শুনে তাড়াতাড়ি বললাম, "না না, আমার খুব ভাল লাগবে। আমি একাই ঠিক চলে যেতে পারব।"

বাবা সিধুমামাকে চিঠি লিখে দিলেন। তিন-চার দিন পরে আমি শিয়ালদা স্টেশনে এসে দার্জিলিং মেলে উঠে বসলাম। গাড়িতে খুব ভিড় ছিল, কিন্তু অল্প বয়সের বলে কোনোমতে আমার একটা বসবার জায়গা হয়ে গেল। ঠিক জানলার পাশেই বসবার জায়গা পেয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। শোবার জায়গা পেলেও আমি সত্যিই তো আর ঘুমোতাম না। ট্রেনের জানলার বাইরে দেখবার মতো এত কিছু থাকতেও লোকে কেন যে ঘুমোয় !

বাবা আমাকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। মা আসতে পারেননি। না এলেও মা আমাকে বার বার করে বলে দিয়েছেন আমি যেন ট্রেনের দরজার সামনে না দাঁড়াই, আজেবাজে কিছু কিনেটিনে না খাই, আমার স্যুটকেসের দিকে নজর রাখি।

গাড়ি ছাড়ার হুইসেল বেজে উঠল। বাবা আমাকে আর একবার সাবধানে থাকতে বলে তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। ট্রেন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাবাকে দেখলাম। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। আমিও হাত নাড়লাম। একটু পরে বাবা আড়ালে চলে গেলেন। একটু একটু করে গাড়ির গতিবেগ বেড়ে গেল। হঠাৎ আমার মা-বাবার জন্যে ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। একা-একা আগে কখনো এতদূরে যাইনি।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি কু-ঝিক-ঝিক করতে করতে ছুটে চলল। একটু পরেই দক্ষিণেশ্বর এসে গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গাড়ি আবার ছুটল গঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে। নদীর ধারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখা যাচ্ছিল। অনেকে হাতজোড় করে প্রণাম জানাল। দেখাদেখি, আমিও হাতজোড় করলাম। ধানের খেত, মাঠঘাট, ডোবা, টেলিগ্রাফের পোস্ট পার হয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। সন্ধেবেলায় ট্রেনে উঠেছিলাম, এখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে চারধারে। দূরে দূরে আলোর বিন্দু ছাড়া আর কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। আমার পাশে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন। বললেন, "অন্ধকারে আর কী দেখবে খোকা, জানলাটা নামিয়ে দি, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই কাঁচের জানলাটা নামিয়ে দিলেন। আবছা কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের কিছুই দেখা গেল না আর।

একটু পরেই গাড়ি এসে থামল বর্ধমান স্টেশনে। বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ মিহিদানা বিক্রি হচ্ছিল স্টেশনে। আমার পাশের ভদ্রলোক সীতাভোগ আর মিহিদানার প্যাকেট কিনলেন। কেউ-কেউ পুরি-তরকারি কিংবা ডিমসেদ্ধ কিনলেন।

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ঝালমুড়ি কিনে খাই। কিন্তু মা'র কথা মনে হতে কিনলাম না। ট্রেনে কিছু কিনে খেতে মা বারবার মানা করে দিয়েছেন। তাছাড়া আমার সঙ্গে অনেক খাবার-দাবার দিয়ে দিয়েছেন। অনেক লুচি আলুর দম তিন চার রকমের মিষ্টি। এত খাবার আমি একা-একা খেতেই পারব না। আমি প্যাকেট খুলে দুটো মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিলাম।

আস্তে আস্তে অনেক রাত হয়ে গেল, সাড়ে এগারোটা বাজে। আমার বাড়ির কথা মনে পড়ছিল।

আমার পাশের সেই ভদ্রলোক চুপচাপ বসে ছিলেন। একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে?"

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, "ন্‌না!"

ভদ্রলোক হাসলেন। যেন আমি সত্যি কথা বলিনি, তা উনি জেনে ফেলেছেন।

ভদ্রলোক একটু পরে বললেন, "একা একা যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?"

আমি বললাম, "ঠিক কোথায় যে যাচ্ছি, মানে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে এক জায়গায় যাব।"

ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। বললেন, "কোথায় যাবে তুমি জানো না? অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

আমি বললাম, "নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আমার মামা আমাকে নিয়ে যাবেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাই বলো।"

আমার তখনই রাজগঞ্জ নামটা মনে পড়ে গেল। বললাম, "জায়গাটার নাম রাজগঞ্জ। রাজগঞ্জে আমার মামা থাকেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "ও।"

তারপর একটু সময় চুপ করে থেকে কী যেন ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোক বললেন, "রাজগঞ্জ? কী নাম বলো তো তোমার মামার?"

আমি মামার নাম বললাম।

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। বললেন, "সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যি? যার আনারস-বাগান আছে? লম্বা-চওড়া চেহারা? গায়ের রঙ খুব কালো?"

আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললাম।

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। একটু সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। আমি বুঝতে পারলাম না মামার নাম শুনে ভদ্রলোক অমন অবাক হয়ে গেলেন কেন। মামার সঙ্গে কি ওঁর কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছে? আস্তে আস্তে বললাম, "আপনি রাজগঞ্জে থাকেন? মামাকে চেনেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি নিউ জলপাইগুড়ি থাকি। সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মানে তোমার মামাকে ঠিক সরাসরি চিনি না, তবে তোমার মামার যিনি তান্ত্রিকগুরু, তাঁর কাছে আমি দু-একবার গেছি। ও-সব ব্যাপারে আমিও একটু ইন্টারেস্টেড কি না।"

তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে আমি দু-একটা গল্পের বই পড়েছি। তান্ত্রিকরা নাকি ভয়ঙ্কর লোক হয়, কী-সব সাংঘাতিক রোমহর্ষক ব্যাপার-ট্যাপার করে। সিধুমামা যে এ-সব ব্যাপারে আছেন তা জানতাম না।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। ডিসেম্বরের শীতের রাত্রি। রাত যত গভীর হচ্ছিল, কনকনে ঠাণ্ডাও তত বাড়ছিল। পুরো-হাতা সোয়েটার পরেও আমার ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি গরম চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে বসলাম।

ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, "আমি জানতাম না যে ভৈরবানন্দ শবসাধনা করেন। সদ্‌গুরু পাওয়া খুব কঠিন।"

আমি বললাম, "ভৈরবানন্দ কে?"

ভদ্রলোক বললেন, "তোমার মামার

তান্ত্রিকগুরু। এই দেখ, তোমার নামটাই আমার জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমার ভালনামটা কী বলো তো ?"

আমি বললাম, "আমার ভালনাম তপন। তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"ইস্কুলে পড়ো ?"

"হ্যাঁ। এবার ক্লাস টেনে উঠব।"

"তুমি এর আগে কখনো তোমার মামার বাড়িতে গেছ ?"

"না।"

ভদ্রলোক আর কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে বসে থাকলেন। মনে হল, চোখ বুজলেও উনি ঘুমোবার চেষ্টা করছেন না। কিছু ভাবছেন। ওঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। কী চিন্তা করছেন কে জানে! ভাবতে ভাবতে আমিও যেন অনেক দূরে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলাম, রেণু-রেণু হয়ে মিশে যাচ্ছিলাম ঘুমের মধ্যে। বাইরের সব কিছু আমার কাছ থেকে অনেকদূরে সরে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই।

খুব সকালে কার হাঁতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল। আমি ভদ্রলোকের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই সোজা হয়ে বসলাম। ভদ্রলোক বললেন, "ওঠো। নিউ জলপাইগুড়ি এসে গেছে। এবার নামতে হবে।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাঁচ তুলে দিলেন।

বাইরের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। সকাল হয়ে গেছে। ঝকঝকে সোনালি রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে মাঠে, ঘাসে, ধানের খেতে।

কী ভেবে যেন ভদ্রলোক বললেন, "আমার নামটা তোমার জেনে রাখা ভাল। সুকুমার ভাদুড়ী—মনে থাকবে নামটা ? নিউ জলপাইগুড়িতে আমার মোটর-গ্যারাজ আছে। নর্থ বেঙ্গল মোটর-গ্যারাজ। মনে থাকবে ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "মনে থাকবে।"

"কোনো দরকার-টরকার হলে আমার খোঁজ করতে পারো।"

আমি আবার ঘাড় নাড়লাম। যদিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ভদ্রলোকের নামটা কেন আমার জেনে রাখা দরকার, কী কারণে

ভদ্রলোককে আমার দরকার হতে পারে !

সুকুমার ভাদুড়ী আর কিছু বললেন না। আমার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন শুধু।

দার্জিলিং মেল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে ঢুকল।

॥ ৩ ॥

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে মনটা দমে গেল। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে কি সিধুমামা বাবার চিঠি পাননি এবং সেইজন্যেই কি স্টেশনে আসেননি ? আমি ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম। বিদেশ-বিভুঁই, কাউকেও চিনি না, সিধুমামা যদি সত্যিই না আসেন তবে আমি কী করব ? রাজগঞ্জ না হয় একে-ওকে জিজ্ঞেসা করে যাওয়া যাবে, কিন্তু সিধুমামার আনারস-বাগানটা ঠিক কোন্ জায়গায় জানি না। শুনেছিলাম রাজগঞ্জ থেকে অনেকটা ভেতরে জঙ্গলের পাশে সে জায়গাটা। খুব ভুল হয়ে গেছে। ট্রেনের ওই ভদ্রলোক, মানে সুকুমার ভাদুড়ী, তিনি হয়তো চেনেন। জেনে নিলেই হত। কিন্তু এখন তো আর জানা যাবে না। তিনি এতক্ষণ স্টেশনের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছেন।

আমি মনখারাপ করে এসব কথা যখন ভাবছিলাম, কে যেন পেছন থেকে খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল। সেই হাতটার দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম এবং দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকালাম। সিধুমামা হাসছেন। আগেও সিধুমামা এইভাবে হাত চেপে ধরতেন।

সিধুমামা আমার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বললেন, "চল্।" যেতে যেতে বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল। আসবার সময় জিপের ইঞ্জিনটা গড়বড় করছিল। গ্যারাজ থেকে ঠিক করে আনতে হল। মাইনর

ডিফেক্ট। যাক, ঠিক ঠিক চলে এসেছিস, অ্যাঁ? মা-বাবা কেমন আছেন?"

সিধুমামার কথা বলার ভঙ্গিটা কেমন যেন অবাঙালি-অবাঙালি। বাবা একদিন বলেছিলেন, অনেক দেশবিদেশ ঘুরলে মানুষের কথাবার্তায় বিশেষ কোনো আঞ্চলিকতার টান থাকে না।

আমি সিধুমামার পেছন-পেছন স্টেশনের ওভারব্রিজ পার হচ্ছিলাম। গ্যারাজের কথায় আমার সুকুমার ভাদুড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর তো নিউ জলপাইগুড়িতে গ্যারাজ আছে। ভাবলাম, ভদ্রলোকের কথা সিধুমামাকে বলি। কিন্তু বললাম না, পরে একসময় বলা যাবে।

হাঁটতে-হাঁটতে সিধুমামা বললেন, "চলে এসে খুব ভাল করেছিস। বাঙালির ছেলেরা খালি ঘরের মধ্যে মায়ের আঁচলের তলায় থাকতে ভালবাসে। যাচ্ছেতাই। যেখানে থ্রিল নেই, অ্যাডভেঞ্চার নেই, সেখানে লাইফও নেই। সমঝা?"

স্টেশনের বাইরে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা জিপটাকে দেখেই চিনতে পারলাম। ওই গাড়িতেই দু-একবার জলপাইগুড়ির বাড়িতে এসেছিলেন সিধুমামা। নিজেই চালান। গাড়িতে উঠে বললেন, "এবার ভাবছি একটা নতুন গাড়ি কিনব। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ির নানান কমপ্লেন, বেকার ঝুটঝামেলা। কিন্তু—"

বলতে বলতে হঠাৎ সিধুমামা চুপ করে গেলেন। আমার মনে হল নতুন গাড়ি কেনার কোনো অসুবিধের কথা তার মনে পড়ে গেছে।

আমি সামনের সিটে সিধুমামার পাশেই বসেছিলাম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগছিল, তবু সকালের তাজা রোদ্দুর বেশ চনমনে মনে হচ্ছিল। এপাশে আকাশের গায়ে সারি সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে খুব কাছেই মনে হল। ফাঁকা রাস্তায় সিধুমামার গাড়ি ছুটে চলল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এখান থেকে পাহাড়ের একটা অংশ খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্ফটিকের মতো ঝকঝকে। সকালের রোদ্দুরের কাঁচা সোনা রঙে-রঙে নীল আকাশের ক্যানভাসে-আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছিল। সিধুমামা গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, "কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

কাঞ্চনজঙ্ঘা আমি চিনি। জলপাইগুড়ি থাকতে শীতকালীন সকালে উত্তরের আকাশে কতদিন দেখেছি। কিন্তু সে-দেখা আর এ-দেখা এক নয়। সে-দেখা এখানকার মতো স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল আর সুন্দর নয়। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি তখন ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল। দুপাশে গ্রাম, মাটির বাড়ি, ধানের খেত, শীতের সব্জির বাগান। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের সামনে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে কেউ-কেউ চা খাচ্ছে।

এ-সব দেখতে-দেখতে যেতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। আমি একবার আড়চোখে সিধুমামার দিকে তাকালাম। সামনের রাস্তায় চোখ রেখে চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছেন।

ফাঁকা মাঠ, ফসলের খেত পেরিয়ে গিয়ে একটু পরে আমাদের জিপ ঘন জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলল। এ-জায়গাটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। লোকজন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গল, নিস্তব্ধ, নির্জন। মাঝে মাঝে অনেকটা জায়গা ঘিরে বাগানের মতো দেখলাম। ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম, ওখানে সারি-সারি আনারসগাছ লাগানো আছে। এইভাবে আনারস-বাগান। যদিও শুধু গাছই দেখলাম, একটাও আনারস চোখে পড়ল না। হয়তো এ-সময় আনারস হয় না কিংবা সব আনারস তোলা হয়ে গেছে।

সিধুমামা বললেন, "এ জঙ্গলটার নাম

জানিস ? বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। অনেকদিন আগে এ জঙ্গলে ডাকাত থাকত। তারও আগে—ভবানী পাঠকের নাম শুনেছিস নিশ্চয় ?"

আমি বললাম, "দেবী চৌধুরানীর ভবানী পাঠক ?"

সিধুমামা বললেন, "দেবী চৌধুরানীর রাজত্বও ছিল এই জঙ্গলে। এ-সব শুধু বঙ্কিমবাবুর নভেলের কথা নয়, এ-অঞ্চলের ইতিহাসও তাই বলে। গ্লোরি অব দি পাস্ট।" বলে সিধুমামা হাসলেন আপনমনে। কেন হাসলেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চুপ করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গভীর অরণ্য। সুদূর অতীত থেকে কত ঘটনার ইতিহাস বুকে আঁকড়ে ধরে নির্বাক হয়ে আছে।

"এই আমার বাড়ি।" সিধুমামার কথায় আমার চমক ভাঙল। গাড়ি এসে থেমেছে সিধুমামার বাড়ির সামনে। সামনে আনারস-বাগান, এপাশে ফাঁকা মাঠ, পেছনে গভীর জঙ্গল। চারধার নিস্তব্ধ, নির্জন। খুব উঁচু-উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর একতলা বাড়ি। দোতলার সমান একতলা। সামনে রেলিং-দেওয়া বারান্দা। কালো রঙ। বাড়িটা যেন জীবন্ত। ড্যাবড্যাব করে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ অজানা ভয়ে শিরশির করে উঠল। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

গাড়ি থেকে নেমে সিধুমামা হাঁক পাড়লেন, "হরিচরণ, হরিচরণ।"

সেই ডাক শুনে কোথা থেকে একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে এল। জিপের কাছে এসে পেছন থেকে আমার স্যুটকেসটা হাতে নিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে সিধুমামা বললেন, "হরিচরণ, জলদি খানা তৈয়ার করো। ভাগ্নেবাবুর খুব খিদে পেয়ে গেছে।"

হরিচরণ নীচে নেমে গেল। ঘরে ঢুকে সিধুমামা বললেন, "খুব টায়ার্ড ? ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে আরাম কর। চা খেয়ে আমি একটু বেরুব। কোনো অসুবিধে হবে না, হরিচরণ আছে।"

আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিধুমামার ঘর দেখছিলাম। সাজানো-গোছানো ঘর। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না এই জনহীন, গ্রাম্য পরিবেশে এই কাঠের বাড়ির ভেতরে এত সব ব্যবস্থা আছে। কাঠের বাড়ি হলেও বেশ বড় বাড়ি। পেছনের দিকে ছোট-ছোট তিনটে ঘর। একটা ঘর তালাবন্ধ। অন্য একটাতে সম্ভবত হাতমুখ ধোয়া, স্নান করার ব্যবস্থা আছে। আর একটায় কী আছে জানি না। ঘরে মধ্যে ড্রেসিং-টেবিল, পালঙ্ক, গদিওয়ালা চেয়ার, স্টিলের আলমারি, সবই আছে। আসবাবগুলো একটু পুরনো ধরনের, ঠিক আধুনিক ডিজাইনের নয়। বড়-বড় জানলায় নকশাদার গ্রিল, হালকা হাওয়ায় পাতলা পর্দা উড়ছে। মেঝেতে ম্যাট পাতা। ঘরের বাইরেটা কালো রঙের হলেও ভেতরে কাঠের দেওয়ালে সাদা রঙ করা। দেওয়ালে সুদৃশ্য ছবি। আরাম করে থাকার মতো সব ব্যবস্থাই আছে। অভাব যেটুকু, তা হল এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। বাড়িটা বাইরে থেকে ভুতুড়ে মনে হলেও ভেতরে ঠিক উলটোটা।

এপাশে কাঁচের আলমারিতে বই সাজানো। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বইগুলো দেখলাম। ইতিহাসের বই, কিছু ভারতীয় দর্শন আর ধর্মের ওপর লেখা বই, গ্রন্থাবলী।

পাশ ফিরতেই দেখলাম দরজার সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পাইনি। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দও শুনিনি। সিধুমামা উলটোদিকে মুখ করে কী যেন করছিলেন

বলে লোকটাকে দেখতে পাননি। লোকটা সিধুমামাকে দেখলেন, তারপর আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। লোকটা ছোটখাটো চেহারার, নাকটা টিকলো, লম্বা। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে ধরনের। চোখদুটো ছোট-ছোট, কিন্তু দৃষ্টিটা অত্যন্ত ধূর্ত। সাপের মতো আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগল না।

"কী চাই মানিকচাঁদ?" সিধুমামার গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনলাম। সিধুমামা এতক্ষণ আমার সঙ্গে যে স্বরে কথা বলেছেন, এই আওয়াজের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। কাঠের ঘরে গমগম করে উঠল সেই গম্ভীর কঠিন গলার স্বর। একই মানুষ যে দু-রকম ভাবে কথা বলতে পারে জানতাম না। এ সিধুমামা যেন সুকুমার ভাদুড়ীর বলা সিধুমামার সঙ্গে অনেকখানি মিলে যায়।

মানিকচাঁদ চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সিধুমামার দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু মুখে হাসল।

সিধুমামা বললেন, "নীচে যাও। আমি যাচ্ছি।"

মানিকচাঁদ আর দাঁড়াল না। সিধুমামাও গম্ভীর মুখে ওর পেছন-পেছন নীচে নেমে গেলেন।

হরিচরণ ওপরে এসে বলল, "গরম জল এনেছি। হাতমুখ ধোবে এসো খোকাবাবু।"

॥ ৪ ॥

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হরিচরণের যত্নের কোনে ত্রুটি ছিল না। সত্যিই খুব কাজের লোক। এর মধ্যেই মুর্গির মাংস রেঁধে ফেলেছিল। হাতের রান্নাও দারুণ। গরম-গরম ভাত আর মুর্গির মাংস খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। নরম গদির বিছানা। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল।

যখন উঠলাম তখন ছোট্ট বিকেলের আলো ফুরিয়ে এসেছে। হরিচরণ ঘরের মধ্যে বসে হারিকেনের চিমনি পরিষ্কার করছিল। আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে বলল, "ঘুম হল খোকাবাবু?"

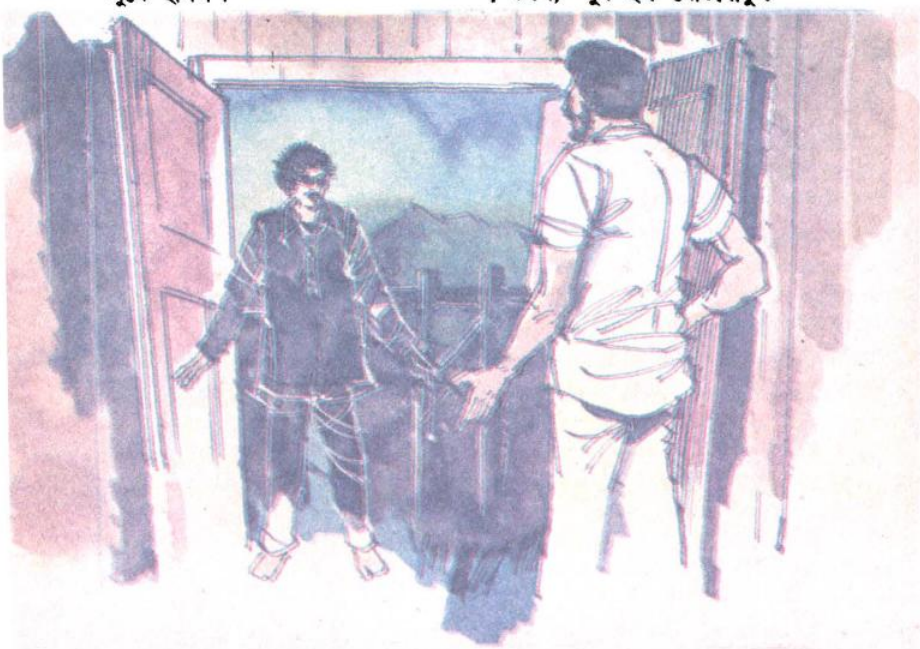

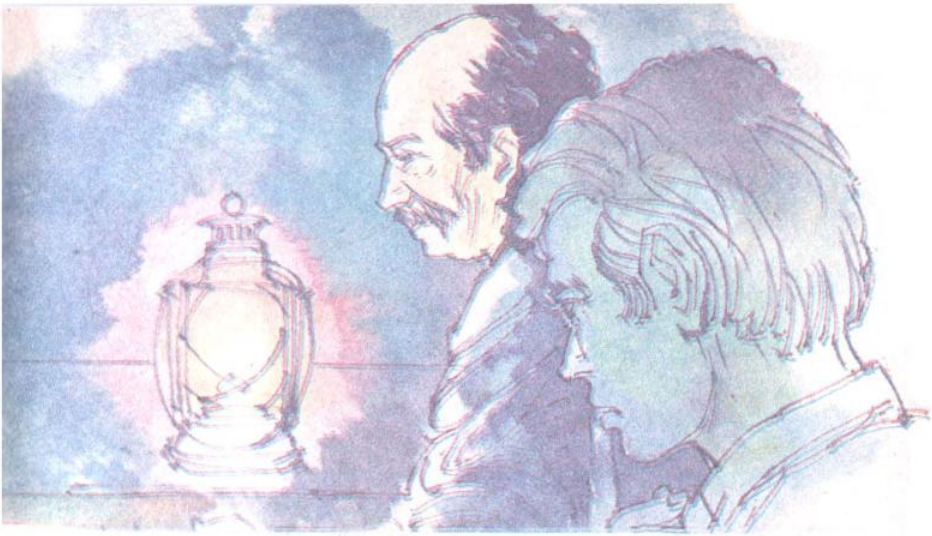

আমি হাই তুললাম, তারপর হরিচরণের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। হরিচরণ চিমনিটা হারিকেনের মধ্যে লাগাতে লাগাতে বলল, "উঠে পড় দিকিনি। অবেলায় ঘুমালি পরে শরীরে রস হয়।"

আমি বললাম, "মামা আসেননি?"

হরিচরণ বলল, "না।"

"এখনো আসেননি? সেই সকালে গেছেন?"

হরিচরণ সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। একমনে কিছুক্ষণ কাজ করে গেল। তারপর বলল, "উনি ওই রকমই।"

"কীরকম?"

হরিচরণ বলল, "তোমার মামার কোনো খোঁজখবর কোরো না খোকাবাবু, কোনো তাল পাবে না।"

"কেন?"

হরিচরণ হারিকেনের পলতেটা ঠিক করতে করতে বলল, "বাবু ওই রকমই। কী খেয়ালে থাকেন ভগবান জানেন। কোথায় যায়, কোথা থাকে, কখন আসে, কখন যায়, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সকালে দেখলে না, ওই ঘাটের মড়াটা ডাকতি এসেছিল।"

বুঝলাম মানিকচাঁদকে হরিচরণ মোটেই ভাল চোখে দেখে না। বললাম, "লোকটা কে?"

মুখ বেজার করে হরিচরণ বলল, "কে আবার, ওই ভৈরবানন্দের চেলা। বাবুর গুরুভাই। ওই বাবুকে ডাকতি আসে, নিয়ে যায়। সব সময় ফিসফিস গুজগুজ।"

ভৈরবানন্দের নাম শুনেছি সুকুমার ভাদুড়ীর মুখে। সিধুমামার তান্ত্রিকগুরু। কথাগুলো মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক। আমি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলাম হরিচরণের দিকে। হরিচরণ একবার আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। যেন আমি কিছু বুঝে ফেলেছি কি না বুঝতে চাইছে। তারপর বলল, "তুমি চা খাও? করে এনে দেব? চা না খাও, দুধ খাও।"

সকালে দুধ খেয়েছিলাম। টাটকা দুধ। আনারস-বাগানের পাশেই মামার গোরুর গোয়াল দেখেছি। কিন্তু এখন আর দুধ খেতে ইচ্ছে করল না। খুব খিদে পেয়েছিল বলে দুপুরবেলায় অনেকখানি খেয়ে ফেলেছি। বললাম, "না, এখন আর কিছু খাব না। আমি বরং এদিক ওদিক একটু ঘুরেফিরে আসি।"

আমি বিছানা থেকে উঠলাম।

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "সে কী! এখন আবার কোথায় যাবে?"

আমি বললাম, "এই কাছাকাছি ঘুরব একটু। সারাদিন ঘরে বসে থেকে কী করব।"

হরিচরণ মাথা নেড়ে বলল, "না না, যেও না খোকাবাবু, এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে।"

অন্ধকার হতে তখনও অনেক দেরি। তা ছাড়া আমি দূরে কোথায়ও যাচ্ছি না। হরিচরণের হঠাৎ এত ভয় পাবার কী হল বুঝতে পারলাম না। হেসে বললাম, "ভয় নেই। বেশি দূরে যাব না। অন্ধকার হলেই চলে আসব।"

হরিচরণ তবু বলল, "কিন্তু বাবু তো আমাকে বলে যায়নি কিছু। তুমি একা-একা যাবে, চেনো না শোনো না—।"

আমি পুরোহাতা সোয়েটারটা পরে চটিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে বললাম, "মামা আবার কী বলবেন?"

হরিচরণ অসহায়ের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল ও পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছে না আমাকে। আমি একটু হেসে ওর মনটা খুশি করে দেবার চেষ্টা করলাম। হরিচরণ সত্যিই খুব ভাল লোক। অনেকদিন ধরে মামার সঙ্গে আছে। সরল, বিশ্বাসী। সিধুমামার মুখে ওর কথা শুনেছি অনেকদিন। মামার দেখাশোনা ওই করে। হাসিমুখে বললাম, "যাব আর আসব। মামা জানতেই পারবেন না।"

হরিচরণ বলল, "বাড়ির কাছেকাছেই থেকো কিন্তু—"

"থাকব।"

"একটু পরেই আমি ডাকতে যাব।"

"যেও।"

নীচে নেমে কথাগুলো চিন্তা করলাম। হরিচরণ ওরকম ভাবে আমাকে বেরুতে মানা করছিল কেন? এখানে এমন কিছু আছে যা হরিচরণ আমাকে জানতে দিতে চায় না? নাকি সিধুমামা বলে যাননি বলেই হরিচরণ আমাকে বেরুতে দিতে চাইছিল না? হয়তো তাই। তাছাড়া আমি এখানে নতুন, বয়স অল্প, বাড়ির পেছনেই জঙ্গল, সেটাই হয়তো হরিচরণের আপত্তির কারণ।

তখন বিকেলের আলো যাই-যাই। উঁচু-উঁচু গাছের পাতায় হলুদ আলো ছিটিয়ে আছে, একটু পরেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। ডিসেম্বরের বিকেল, এই আছে এই নেই। উত্তরের আকাশে মেঘ জমেছে। হয়তো বৃষ্টি হবে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা চলবে না। আমি বেড়াতে বেড়াতে একটু দূরে এগিয়ে গেলাম। বিরাট জায়গা জুড়ে আনারস-বাগান। সারি-সারি আনারস গাছ। এখন আনারসের ফলনশেষে নতুন গাছের প্লানটেশন হচ্ছে। ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার হচ্ছে। কাঁটাতার দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ঘিরে রাখা হয়েছে। হরিচরণ সকালে বলছিল বর্ষার সময় গাড়ি-গাড়ি আনারস বাইরে চলে যায়। বড়-বড় শহরের কারখানায় আনারসের নানান রকম জিনিস হয়।

আনারস-বাগানের একধারে ছোট-ছোট দু-চারটে কাঠের বাড়ি। বাগানের চৌকিদাররা থাকে। এর একটাতে হরিচরণও বুঝি থাকে, সেইরকমই তখন বলছিল যেন। আমি যখন ওই বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম একজন লোক বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বোধহয় আমাকে দেখেই। ষণ্ডামার্কা চেহারা। এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন আমি কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছি। ওদিকে আমি আর এগোলাম না, ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর আনারস-বাগান পার হয়ে আবার সিধুমামার বাড়ির কাছে এলাম। পায়ে-পায়ে জঙ্গলের দিকে এগোলাম। আসলে ওই গভীর জঙ্গলই আমাকে আকর্ষণ করছিল।

অনেক দূর চলে এসেছিলাম। মনে হল চারধার কেমন যেন থমথম করছে। চারপাশের গাছ-গাছালি মাঠ-ঘাট ঝোপ-জঙ্গল কেমন যেন স্থির হয়ে গেছে। কোথাও কোনে শব্দ নেই, জনমানুষ নেই, এক পরিত্যক্ত নির্জন জগতে আমি যেন একা-একা হেঁটে চলেছি। অজানা কারণে আমার গা ছমছম করে উঠল। এ-সময় দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়ল গায়ে। আকাশে তাকিয়ে দেখলাম খুব একটা মেঘ নেই। শীতকালের মেঘ, খুব একটা বৃষ্টি হয়তো হবে না। দেখতে-দেখতে আরো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। অন্ধকারও ততক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে। এবার ফিরতে হয়। বৃষ্টি ঝিরঝির করে নেমেছে। আশেপাশে বাড়িঘর কিছু নেই। এদিক-ওদিক তাকাতেই একটু দূরে একটা ভাঙা বাড়ি দেখা গেল। পুরনো একতলা ইটের বাড়ি। আমি তাড়াতাড়ি ওই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আপাতত এই বাড়িতেই মাথা বাঁচানো যাবে।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখলাম জানলা নেই, দরজা নেই। দেওয়ালের ইট-পলেস্তারা খসে পড়েছে, ভেতরটা অন্ধকার। আমি ভেতরে ঢুকলাম না, সামনের একফালি বারান্দার মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। আর কিছু না হোক এসব পুরনো বাড়িতে সাপখোপ থাকতে পারে। তাছাড়া ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, শীত জাঁকিয়ে আসছে। হরিচরণ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। আমাকে একা-একা ছেড়ে দিতে ওর একদম ইচ্ছে ছিল না। হয়তো বাড়িতে এখন অস্থির হয়ে ঘর-বার করছে। আমি সামনের অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এই ভাঙা ঘরে আমি একা নই। আর একজন কে যেন আছে। কথাটা মনে হতেই আস্তে আস্তে পেছন ফিরে তাকালাম। আর পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম দরজার সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

আধো অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না, তবু ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম একটা বুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো একজন গরিব মানুষ, এই ভাঙা বাড়িতে কোনোমতে মাথা গুঁজে থাকে। কিন্তু একটু পরেই আমার কেমন যেন মনে হল। আমার গা-হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল। বুড়িটা নড়েও না, চড়েও না, নিশ্চল ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা শীতল শরীর যেন সম্মোহিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার মনে হল বুড়িটা হি-হি করে হাসছে, সেই হাসিটা একটা হিসহিস শব্দ হয়ে আমার কানে বাজল। একটা হিমশীতল হাওয়া আমার শরীরকে জড়িয়ে ধরল। আমি তাড়াতাড়ি সেই ভাঙা বাড়ি থেকে নীচে নেমে এলাম। বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে চারধারের ছমছমে নির্জনতার মধ্যে আমি বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চললাম সিধুমামার বাড়ির দিকে। আমার মনে হচ্ছিল আমার পেছন পেছন একজোড়া জ্বলন্ত চোখ যেন আসছে। আমি দমবন্ধ করে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ আমার মনে হল আমার সামনে ঘাসের ওপর দিয়ে কালো লম্বা রেখার মতো কী একটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ভয়ের একটা অস্ফুট শব্দ করে থমকে দাঁড়ালাম। একটা বিরাট সাপ সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। জঙ্গুলে বিষধর সাপ, একটু হলেই সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলতাম। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি, তখনই আমার পেছনে একটা বেড়াল ডেকে উঠল—ম্যাও! আমি চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকালাম। কিছুই নেই, শুধু শব্দহীন বর্ণহীন অন্ধকার। কিন্তু সত্যিই তো একটা বেড়াল এক্ষুনি

আমার খুব কাছেই ডেকে উঠল। বেড়ালটা কোথায় গেল! এমন সময় কানে এল দূর থেকে আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কে যেন আসছে। এবার পরিষ্কার শুনলাম হরিচরণের গলা। হরিচরণ আসছে। ওর হাতে হারিকেনের আলো অন্ধকারে দুলছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। সেই আলো লক্ষ করে আমি পাগলের মতো ছুটে গেলাম।

বাড়িতে ফিরে হরিচরণের বিস্তর বকাবকি শুনতে হল। অনেকক্ষণ আমাকে ফিরতে না দেখে শেষে সে নিজেই হারিকেন হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিল। অতদূর আমার একা-একা যাওয়া উচিত হয়নি।

জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা পরে আলোয়ান গায়ে আমি চেয়ারে বসেছিলাম। আমি এতক্ষণ কোনো কথাই বলিনি। পর-পর কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটে গেছে। আমি চুপ করে বসে থেকে সেইসব কথাই ভাবছিলাম। নীচে রান্নাঘর। হরিচরণ গরম দুধ আর হালুয়া নিয়ে এল। আমি এবার বললাম, "ওই দিকে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙামতো বাড়ি আছে, না?"

হরিচরণ কেমন যেন সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আছে তো। কেন?"

"ওই বাড়িতে একটা বুড়িকে দেখলাম। বুড়িটা কে?"

হরিচরণ চমকে উঠল আমার কথা শুনে। বলল, "তুমি দেখেছ, নিজের চোখে দেখেছ খোকাবাবু?"

"হ্যাঁ। নিজের চোখেই তো দেখলাম।"

হরিচরণ সভয়ে বলল, "ঠিক এই জন্যিই তো তোমাকে যেতে মানা করেছিলাম।"

"কেন?"

হরিচরণ বলল, "থাক। তোমাকে আর শুনতি হবে না। ছেলেমানুষ, শেষটায় ভয় পাবে রাত্তিরে।"

কিন্তু আমার ঝোঁক চেপে গেল শুনব বলে। বললাম, "বলো না, আমি ভয় পাব না।"

"না, থাক।"

"না, থাকবে না। বলো। আর তুমি যদি না বলো তবে আমি দুধ-টুধ কিছুই খাব না।"

হরিচরণ এবার একটু নরম হল। তবু বলল, "শুনে কী হবে খোকাবাবু?"

আমি বললাম, "আমি এখানে কিছুদিন থাকব। সব কিছু আমার জানা দরকার।"

হরিচরণ বাইরের অন্ধকারের দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকাল। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একটু সময় কান পেতে

কী যেন শুনল সে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ও বুড়ি মানুষ নয় খোকাবাবু, ও যখ। তোমার মামার গুপ্তধন পাহারা দেয়।"

যখ সম্বন্ধে আমি শুনেছি। মাটির তলায় থাকে গুপ্তধন। যখ পাহারা দেয় সেই ধনসম্পত্তি। যেখানে মাটির তলায় সেই ধন লুকানো থাকে, তার ওপরে থাকে কালনাগিনী, বিশাল ফণা তুলে তাকিয়ে দেখে চারদিক। ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে। সেই সম্পত্তিতে যার অধিকার নেই, তার ক্ষমতা নেই ত্রিসীমানায় যায়।

হরিচরণ আবার বলল, "ওরা মানুষের আত্মাকে যখ করেছে। সেই যখকেই দেখা যায়, কখনো বুড়ি, কখনো ইয়ে, মানে লতা। লতা বুঝলে তো খোকাবাবু, রাত্তিরি নাম নিতি হয় না।"

আমি বললাম, "জানি, সাপ। সাপও তো আমি দেখেছি হরিচরণদা, ইয়া লম্বা।" বলতে বলতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। বিশাল সাপ সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পেছনের অন্ধকারে ডেকে উঠল বেড়াল। সব কথা বললাম হরিচরণকে।

হরিচরণ চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী বলছিল যেন। বোধহয় ইষ্টদেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে ভক্তি জানাল কিছুক্ষণ ধরে। দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বসল কাঠের মেঝেতে।

আমি বললাম, "হরিচরণদা মামার গুপ্তধন আছে?"

হরিচরণ ভয়ে ভয়ে চারপাশ দেখে নিল। যেন কেউ ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আমাদের কথা শুনে নিচ্ছে। তারপর ফ্যাকাসে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। বলল, "ওকথা জানতে চেওনি খোকাবাবু, কাউকেও বোলো না যেন। ও কথা বলার নিষেধ আছে। তবু তোমাকে বলি। আছে বইকি।

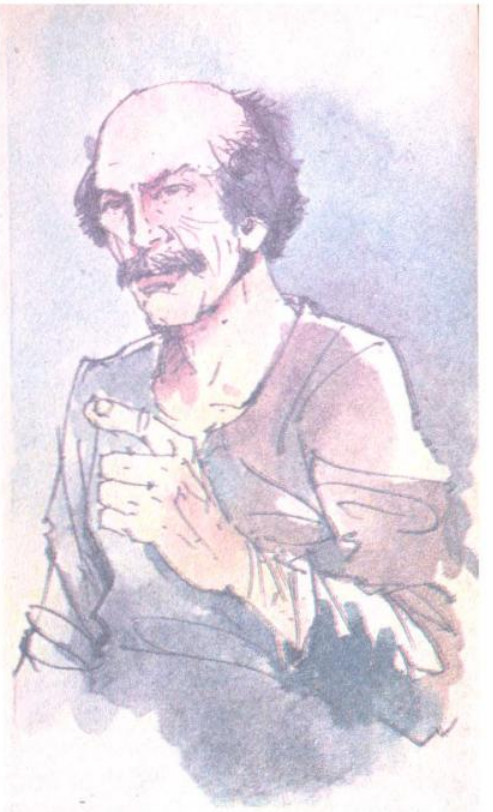

তোমার মামার অনেক সোনা-রুপা লুকানো আছে মাটির তলায়। আমি দশ বছর ঘর করছি। আমাকে না বললেও কি টের পাই না কিছু? সব টের পাই খোকাবাবু। এই আনারস-বাগান তো বাবুর লোক-দেখানো ব্যাপার। অনেকদিন নেপালে ছিলেন তো, কী করতেন কে জানে, তবে ভাবে ইঙ্গিতে বুঝেছি নেপাল থেকে চোরাপথে বিস্তর সোনা-রুপা এনেছিলেন বাবু। তা শুধু সোনা নয়, সোনা ছাড়া আর একটা জিনিস এনেছেন বাবু—।"

"কী?"

"এই যা নিয়ে মেতে আছেন। শ্মশানে-মশানে জঙ্গলে রাত্তির কাটান।"

"তন্ত্র ? তান্ত্রিক ব্যাপার-ট্যাপার ?"

"হ্যাঁ গো খোকাবাবু। ওই সবই শিখে এসেছেন নেপাল থেকে। ওই ভৈরবানন্দ, ওই হচ্ছে গুরু। দাদাবাবু ওই নিয়ে আছেন দিনরাত। এ যে কী নেশা বুঝবে না। এই নেশায় দাদাবাবু পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"ঐ যে যখের কথা বললে —"

"তাই তো শুনি। শুক্কুরবার সোমবার হাটে যাই, সেখানে নানান লোকে নানান কথা বলে। মরা মানুষের আত্মাকে নাকি যখ করা হয়েছে। ওই যে বুড়ি দেখলে না, ও ছিল ভিখিরিবুড়ি, তিন কুলে কেউ ছিল না, একদিন মরল। তা ঝড়বৃষ্টিতে যারা পোড়াতে এসেছিল, তাদের ভয় দেখানো হয়। তারা ভয় পেয়ে মড়া ফেলে পালায়। তখন ওই মড়ার ওপর বসে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে যখ করা হয় ধনসম্পত্তি পাহারা দেবার জন্যে। লোকে তো তাই বলে। ওই ভাঙা বাড়িতে যে বুড়িটা থাকে, ও নাকি সেই বুড়ি।"

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাত। ঘরের মধ্যে হারিকেনের কাঁপা আলোর দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে হরিচরণ কথা বলছে। আমি আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললাম, "এ-সব তো গল্পও হতে পারে। লোকে তো অস্বাভাবিক মানুষ দেখলে নানান কথা বানিয়ে গল্প তৈরি করে। আসলে হয়তো কিছুই নয়।"

হরিচরণ ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে বলল, "না গো খোকাবাবু, সব সত্যি। বললে পেত্যয় যাবে না, এখানে ভয়ানক সব ব্যাপার হয়। রাতের অন্ধকারে কতরকম লোক আসে। ঐ জঙ্গলের মধ্যে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরের কাছেই শ্মশান। অমাবস্যার রাতে মড়া যোগাড় করে এনে সেই মড়ার ওপর লাল কম্বল পেতে বসে তন্ত্রসাধনা করা হয়। ওই যে চামুণ্ডার মন্দিরের কথা বললাম, ওখানে আগে নরবলি হত। দেবী শুধু রক্ত চায়। ভীষণ জাগ্রত।"

আমি বললাম, "তুমি এসব দেখেছ ? ওই মড়ার ওপর লাল কম্বল পেতে বসে মন্ত্রতন্ত্র ?"

হরিচরণ বলল, "নিজের চোখে কি সব দেখতি হয় খোকাবাবু ? নিজে না দেখলেও যে দেখেছে তার মুখে এ-সব শুনেছি। ওই যে পুবপাড়ার গোকুল বসাক, ইয়া তাগড়া জোয়ান, ভয়ডর বলতি কিছু নেই, ওই দেখেছে সব একদিন রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে। সে খোকাবাবু, ভয়ানক কাণ্ড, বলতিও ভয় লাগে।"

"বলো না, কী সাংঘাতিক কাণ্ড দেখেছিল গোকুল বসাক ?"

হরিচরণ একটু কাছে সরে এসে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার দুধ আর খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

ঠিক এমন একটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত আমার অন্য কারণে নষ্ট করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তবু হরিচরণকে খুশি করার জন্যে একটু হালুয়া মুখে দিয়ে লম্বা এক চুমুকে দুধটা শেষ করে দিয়ে বললাম, "বলো।"

হরিচরণ বলল। শুনতে-শুনতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যা কিনা গোকুল বসাক গাছের আড়াল থেকে দেখে শিউরে উঠেছিল। কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্দশীর গভীর রাত্রি। নির্জন গ্রামের শ্মশান। সেই শ্মশানে চিতার ওপর জ্বলন্ত একটা মৃতদেহকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন লোক। চিতার আগুনে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তাদের ভয়ানক মুখগুলো। রক্তজবার মতো তাদের চোখ। তাদের মধ্যে ভৈরবানন্দ আছেন, সিধুমামাও আছেন। ভৈরবানন্দ মন্ত্র পড়ছেন। মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনি হাতে নিলেন নতুন

মাটির সরা। তারপর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে কার নাম ধরে ডাকলেন। মরণ-উচাটনি সে ডাক। দীর্ঘসুরে ডাকা সেই নামের উচ্চারণ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সরার মুখ বন্ধ করে দিলেন তান্ত্রিকসাধু। তারপর হাতের আঙুল কেটে সেই রক্ত দিয়ে সরার বুকে কিছু লিখলেন। বাস্, কোনো জীবিত ব্যক্তির আত্মা বন্দী হয়ে গেল সরার মধ্যে। আর মৃত ব্যক্তির আত্মা চলে গেল জীবিত মানুষের শরীরে। এখন মৃতের আত্মার ইচ্ছেতে চলবে জীবিত কোনো মানুষ।

শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরের মধ্যে। তখনই শব্দ করে বাড়ির সামনে এসে থামল জিপ। সিধুমামা এসেছেন।

হরিচরণ উঠে দাঁড়াল। দরজার সামনে তাকাল। একটু পরেই ভারী পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার সামনে থামল। তারপর পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলেন সিধুমামা। হরিচরণের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "চৌকিদার বলল, তপু জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল।"

হরিচরণ আমতা-আমতা করে বলল, "আমিই খোকাবাবুকে বলেছিলাম সামনের দিকে একটু পায়চারি করে আসতে। বলল খুব মাথা ধরেছে। তা একটু পরেই আমি ডেকে নিয়ে এসেছি।"

কী ভয়ানক ভালমানুষ এই হরিচরণ। সমস্ত ব্যাপারটার দায়ভাগ সে নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। কিন্তু খুব খুশি হলেন না সিধুমামা। মাথা নাড়িয়ে বললেন, "ভেরি ব্যাড হরিচরণ, ভেরি ব্যাড। বিলকুল ঠিক নেহি। তপুর ভালমন্দ দেখাশোনার ভার তোমার ওপর।"

হরিচরণ অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে রইল। কিছু বলল না। সিধুমামাও সে প্রসঙ্গে আর গেলেন না। একটু পরে বললেন, "আজ রাতে কি খাওয়াচ্ছ হরিচরণ?"

হরিচরণ বলল, "নদীর মাছ কিনেছি বিকেলবেলায়। বরুলি মাছ। মাছের ঝোল আর ফুলকপির তরকারি।"

সিধুমামা ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ে খুশির গলায় বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস। কী তপুবাবু, লোকাল ফিশ চলবে তো? বরুলি এখানকার স্পেশাল মাছ, হাইলি টেস্টফুল—।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বড় বিছানায় আমার শোবার ব্যবস্থা হল, যে বিছানায় সিধুমামা শোন এবং দুপুরে আমি শুয়েছিলাম। নিজে পাশের ঘরে শোবেন, সে ঘরটা সব সময় তালাবন্ধ থাকে। সকালবেলায় হরিচরণের মুখে শুনেছিলাম ওই ঘরে কী আছে হরিচরণ নিজেই তা জানে না। ঘরের চাবি সব সময় সিধুমামার কাছেই থাকে। মাঝে-মাঝে ওই ঘরে সিধুমামা রাতে থাকেন। ভৈরবানন্দ এলে অনেক সময় ওই ঘরেই কথাবার্তা হয়।

এতবড় আরামের বিছানায় একা-একা শোব, তাই আমি একটু আপত্তি জানিয়ে বললাম, "এক বিছানায় দুজন শুলে অসুবিধে হবে না।"

সিধুমামা জিভ কেটে বললেন, "তা কি হয়, তোমার ঠিকই অসুবিধে হবে। এখন এই ঘরের মালিক তো শ্রীমান তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।" বলেই সিধুমামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসি আমার কানে একরাশ শব্দ হয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠল। অথচ কথাটার মধ্যে এত হাসির মতো কিছুই ছিল না। আমি দেখলাম হরিচরণ বড়-বড় চোখ করে সিধুমামার অট্টহাসি শুনছে। সিধুমামা আর দাঁড়ালেন না। সেই ছোট্ট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি আর হরিচরণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সেই বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকালে ভৈরবানন্দ এলেন। নামের সঙ্গে চেহারার বেশ মিল। দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায়। মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ভারী, থ্যাবড়া নাক-মুখ। বাঘছালের পঞ্চমুণ্ডির আসনের ওপর বসে আছেন ঘরের মেঝেতে। পাশে পশমের আসনে বসে আছেন সিধুমামা। আমাকে দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, "বোসো, তুমি আমার সামনে বোসো।"

আমি সিধুমামার দিকে তাকালাম। সিধুমামা চোখ দিয়ে আমাকে ইশারা করলেন বসবার জন্যে। আমি ভৈরবানন্দের মুখোমুখি বসলাম। ভয় কিংবা ভক্তি নয়, আসলে মানুষটাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। ভৈরবানন্দ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনে হল সেই গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমাকে যেন চুম্বকের মতো টেনে আনছে।

ভৈরবানন্দ বললেন, "ভারী সুলক্ষণযুক্ত ছেলে। খুব ভাল লক্ষণ এর মধ্যে আছে সিদ্ধেশ্বর।"

সিধুমামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঁকে প্রণাম করো?" তারপর ভৈরবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তপু খুব ভাল ছেলে। এই জন্যেই প্রথম থেকে ওকে আমার ভাল লেগেছে।"

আমি যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নিচু করে ভৈরবানন্দকে প্রণাম করলাম। উনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন।

সিধুমামাকে দেখলাম উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন। আমাকে ভাল বলাতে এবং বিশেষভাবে আশীর্বাদ করাতে উনি খুব খুশি হয়েছেন।

"আজ এই পর্যন্ত। এখন আমি উঠব।" বলেই ভৈরবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "সিদ্ধেশ্বর, বাইরে চলো।"

সিধুমামা উঠলেন। একটু পরেই ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। নীচে জিপ স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ পেলাম। একসময় সেই আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

হরিচরণ ঘরে এল। বলল, "গুরু কী বললেন তোমাকে?"

হেসে বললাম, "ভালই বলেছেন।"

"কী বলেছেন?"

"বললেন, আমি নাকি সুলক্ষণযুক্ত ছেলে।"

হরিচরণ চমকে উঠে বলল, "সে কী?"

আমি বললাম, "কী হল?"

"গুরু এই কথা বলেছেন তোমাকে?"

আমি হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝলাম কথাটা খুব ভাল অর্থে গ্রহণ করেনি সে। অথচ ভৈরবানন্দ তো

আমাকে ভাল কথাই বলেছেন। আমার মধ্যে ভাল লক্ষণ দেখেছেন, আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।

হরিচরণ একটু পরে রান্নার যোগাড় দেখতে চলে গেল। মনে হল ও কোনো একটা জটিল চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। গ্রামের মানুষ।

কিছুক্ষণ পরেই হরিচরণ আমার ঘরে এসে বলল, "কী নামটা বললে যেন তখন ? রেলগগাড়িতে কার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যেন বললে ?"

আমি বললাম, "সুকুমার ভাদুড়ী।"

"ওই ভদ্রলোক তো বলেছিলেন দরকার হলে খোঁজ করতে।"

"হ্যাঁ। কেন ?"

হরিচরণ অন্যমনস্কভাবে বলল, "না, নামটা মনে পড়ছিল না কি না, তাই।"

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম হরিচরণ এমনি-এমনি ওই নামটা জানতে আসেনি। কোনো ব্যাপারে ও দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

হরিচরণের কী হল কে জানে। আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলল না। গম্ভীর মুখে নিজের কাজকর্ম করে গেল। আমি দু-একবার দু-চারটে কথা বললাম, হরিচরণ হুঁ-হ্যাঁ করে সংক্ষেপে উত্তর দিল শুধু। দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে বলল, "একটু হাটে যাব খোকাবাবু।"

আমি বললাম, "যাও না।"

হরিচরণ বলল, "যতক্ষণ না ফিরি তুমি কিন্তু বাড়িতে থেকো।"

আমি মজা করার জন্যে বললাম, "আমি ভাবছি একটু শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসব।"

হরিচরণ আমার কথায় ব্যস্ত হল না। ম্লান হেসে বলল, "তা তুমি আর এখন যাবে না খোকাবাবু।"

আমি বললাম, "কেন ? এখন যাব না কেন ?"

হরিচরণ বলল, "তোমার যেতে ইচ্ছেই করবে না।"

"ইচ্ছে করবে না কেন ?"

হরিচরণ আমার কথার সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, "সব সময় কি সব ইচ্ছে করে ! তা, তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।"

হরিচরণ চলে যাবার পর ওর কথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করার পরও কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই কেমন ভারী-ভারী ঠেকছিল। শরীর যে খারাপ হয়েছে, তাও নয়। আমি বিছানা থেকে উঠে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আস্তে-আস্তে বিকেল এসে গেল। ঝিমিয়ে এল দিনের আলো। হরিচরণ এখনো ফেরেনি। আমার সময় আর কাটছিল না। আলমারি থেকে দু-একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। মন লাগল না। আমার ভাল লাগার মতো বই একটাও নেই।

একটু পরেই সিধুমামার জিপ এসে থামল বাড়ির সামনে। এবার ভৈরবানন্দ আসেননি। সিধুমামা ঘরে ঢুকে বললেন, "হরিচরণ কই ?"

আমি বললাম, "হাটে যাচ্ছি বলল। সেই দুপুরে গেছে।"

"ও। আজ তো হাটবার। কিন্তু—" সিধুমামা হাতঘড়িতে সময় দেখে বললেন, "এতক্ষণ তো ফিরে আসে। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে ?"

আমি হেসে বললাম, "না, আমার মোটেই খিদে পায়নি।"

সিধুমামা চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টানলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "তপু, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বোসো।"

আমি বিছানার ওপর বসলাম।

সিধুমামা বললেন, "একা-একা খুব বোর লাগছে?"

আমি বললাম, "না তো। আমার তো ভালই লাগছে। সবই নিজের মতো মনে হচ্ছে।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সিধুমামা হাসলেন। বললেন, "ঠিক। নিজের জিনিস তো নিজের মতোই মনে হবে।" বলতে বলতে সিধুমামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "তপু, তুমি হয়তো জানো না আমি প্রচুর অর্থের মালিক। বাইরে থেকে আমার যতটুকু দেখছ তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আমার আছে। হ্যাঁ, অনেকই অর্থ আমার আছে। নেপাল এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক বছর কাটিয়েছি। ভাল-মন্দ নানান ধরনের ব্যবসা-ট্যবসা করেছি। আমার এখন অনেক সম্পত্তি।"

সিধুমামা চুপ করলেন। বাইরে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। হরিচরণ এখনো ফেরেনি।

"গ্লোরি অব দি পাস্ট—তপু, তুমি হয়তো জানো না, এককালে আমরা খুব উন্নতজাতের মানুষ ছিলাম। বিদেশীদের লেখা ইতিহাস আমরা পড়ি, তাতে ভারতবর্ষের পরাজিত রাজাদের কথা লেখা আছে শুধু। কিন্তু অতীত ভারতবর্ষে একদিন আধ্যাত্মিক শক্তিতে, ধর্মসাধনায়, জ্ঞানচর্চায় আমরা কত বড় জাতি ছিলাম, তা আমরা জানি না। বড়-বড় ব্যাপারের কথা না বলে আমি বিশেষ করে তন্ত্রসাধনার কথা বলি। এই সাধনা এককালে জরা-বার্ধক্যকে জয় করে মানুষের জীবনে অফুরন্ত প্রাণশক্তি এনে দিয়েছিল। মৃত্যুকে তো জয় করা যায় না, কিন্তু আত্মাকে প্রবল ইচ্ছের বলে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। নেপালে থাকতেই এ-সম্বন্ধে কিছু-কিছু জেনেছিলাম, অনেক বই পড়েছি, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসেছি। এই তন্ত্রসাধনা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। এখন এটা আমার নেশা কিংবা পেশা কিংবা যা কিছু বলতে পারো।"

আমি সিধুমামার কথা শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম সিধুমামা এবার আসল কথায় আসবেন। কী কথা আমি জানি না, কিন্তু কথাগুলো আমার চারপাশে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল যেন। আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। আমার এ-রকম কেন মনে হচ্ছে? আমি আগে-আগেই আভাস পেয়ে যাচ্ছি কেন? এখানে কি আমার মধ্যে কোনো অপার্থিব শক্তি ভর করেছে?

সিধুমামাকে দেখলাম একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। নিজের কথা বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজেকে সংযত করতে-করতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তপু।"

"বলুন?"

"আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে তপু।"

একটা চাপা হাহাকারের মতো শোনাল সিধুমামার গলা। আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, "আপনি এ-কথা ভাবছেন কেন মামা?"

সিধুমামা বললেন, "কিন্তু সব কিছু ফেলে এতগুলো বছরের জীবনের নেশা কি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়? আমার এত কষ্টের ধনসম্পদ, তপু।"

আমি আবার বললাম, "আপনার কী হয়েছে মামা?"

মাথা নাড়িয়ে সিধুমামা বললেন, "বাইরে থেকে আমার কিছুই হয়নি, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি তিল-তিল করে ফুরিয়ে যাচ্ছি। প্রবল মনের জোর আর তন্ত্রসাধনার বলে আমি অনেকদিন বেশি বেঁচে আছি তপু। আসলে আমার অনেক

দিন আগেই মরে যাবার কথা। এতকাল বেঁচে আছি, কিন্তু এখন এই শরীর আমার কাছে এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পারছি না। মৃত্যু আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে ছায়ার মতো।"

বলতে বলতে সিধুমামা যেন মুক্ত বাতাসে দম নিলেন। তারপর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, "কিন্তু তপু, আমার যে একটুও চলে যেতে ইচ্ছে করে না। আমার এই শরীরের মৃত্যুর পরেও না। আমার সব কিছু তাই তোকেই দিয়ে যেতে চাই। হ্যাঁ, তোকেই। তোকে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই তাই ভেবেছি। তোর মধ্যেই আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

সিধুমামার কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালির মতো। সিধুমামা আবার বললেন, "আমার যা কিছু আছে, সবই তোকে দিয়ে যাব।"

সিধুমামা তাঁর প্রচুর অর্থ আমাকে দিয়ে যাবেন, অথচ আমি অবাক হলাম না। শুনে চমকে উঠলাম না। এ-কথা শোনার জন্যে আমি যেন অপেক্ষা করে ছিলাম। এ কেমন করে হল ? আমার শরীর শির-শির করে উঠল।

দরজার সামনে কার ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম হরিচরণ এসে দাঁড়িয়েছে। সিধুমামা হরিচরণের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন পলাতক কোনো আসামির ঘরের দরজার সামনে পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একটু পরেই সিধুমামা ধাতস্থ হয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "এত দেরি হল কেন ?"

হরিচরণ কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির সামনে অনেক মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। উত্তেজিত হয়ে অনেক মানুষ যেন কী সব বলাবলি করছিল। সিধুমামা বললেন, "দেখ তো, কারা।"

হরিচরণ নীচে নেমে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "বস্তি থেকে লোক এসেছে। বলছে যে হাতির পাল জঙ্গল থেকে নেমে এসেছে। এখন বস্তির আশেপাশের জঙ্গলে আছে।"

সেই কথা শুনে সিধুমামা সোজা হয়ে বসলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন বস্তির আদিবাসী মানুষদের কথা শুনতে।

আমি হরিচরণকে বললাম, "হাতির পাল এসেছে তো মামা কী করবেন ? ওরা দল বেঁধে মামার কাছে এসেছে কেন ?"

হরিচরণ হারিকেনের আলো জ্বালতে-জ্বালতে বলল, "তোমার মামাকে এদিককার মানুষজন তাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা জানায়, মান্যি করে। ওঁর বন্দুক আছে। তা ছাড়া ফরেস্টের রেঞ্জারবাবু, বিট অফিসার, এরা বাবুর চেনাজানা লোক। সবাই মিলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে।"

"কী ব্যবস্থা করবে ?"

"ওই হাতির পাল তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। লোকজন জড় করে আগুন জ্বেলে বন্দুকের শব্দ করে হাতিদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে।"

সিধুমামা ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছিল। বস্তির লোকজনকে বুঝিয়ে আপাতত ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা তিনি নেবেন।

রাত্রি আটটা নাগাদ সিধুমামা বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে নিলেন বন্দুক। বন্দুকটা আমি এতক্ষণ দেখিনি। ওটা ছিল সিধুমামার নিজস্ব ঘরে। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন যে, রাতে তিনি নাও ফিরতে পারেন।

শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়ল রাত্রিবেলায়। আমিও তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি যে, হরিচরণ চুপচাপ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে বেশি

# হাতখরচের টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়েই আমি এই সাইকেল কিনেছি

বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা
সাইকেল নয়।
এটা আমার নিজেরই।
সাইকেল কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি
যখন, বাবা বললেন, ইউকোব্যাঙ্কে
জমাও, টাকা বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি
তাই করলাম।
নিজের টাকা, সুদের টাকা।
বেশিদিন লাগে নি। নিজের সাইকেলে
চড়া, বড়ো আরাম।

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোবাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS.100/82 BEN

কথাবার্তা বলছে না।

রাত্রি এখন কত কে জানে। দেড়টা-দুটো হতে পারে। সিধুমামা ফেরেননি। বিছানায় শুতে যাবার একটু পরেই অনেক দূরে হৈ-হল্লা টিন পেটানোর শব্দ শুনেছিলাম, বন্দুকের আওয়াজও হয়েছিল দু-একবার। বুঝলাম, হাতি তাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। শরীরটা ভারী-ভারী লাগছিল সকাল থেকেই। কেন লাগছিল, কে জানে! অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে এক সময় উঠে বসলাম বিছানার ওপর। কম্বলটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। জানলার কাঁচের বাইরে কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি, ঘন কালো অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে গেছে পৃথিবী। কিছু দেখা যায় না। চারধার নির্জন, নিস্তব্ধ। জানলার কাছ থেকে সরে এলাম। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর দরজার খিল খুলে বাইরে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে টের পেলাম টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, জানি না। কোনো অদৃশ্য শক্তির টানে যেন এগিয়ে যাচ্ছি। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, জীবনের সাড়া নেই। কবেকার এক পরিত্যক্ত প্রেতপুরীতে যেন আমি পৌঁছে গেছি।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হল আমার পেছন থেকে কে যেন ছুটে আসছে। আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, অন্ধকারেও ঠিক ঠাওর করতে পারলাম, পোড়োবাড়ির সেই বুড়িটা ঝড়ের মতো ছুটে আসছে। তার শনের মতো সাদা চুল হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে। হাতদুটো কিছু ধরতে যাওয়ার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা। কোথা থেকে একটা অপার্থিব শব্দ অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে এল, হু-ই-ই-ই। সেই শব্দের সঙ্গে আমার পাশ দিয়ে বুড়ি ছুটে গেল পোড়ো বাড়ির দিকে। আমি দেখলাম সেই বাড়িতে একটা আলো দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে গেল। হাওয়া উঠল, আকাশে মেঘ ডাকল আর আগের মতোই কোথায় যেন একটা বেড়াল ফ্যাঁসফেসে গলায় ডেকে উঠল, ম্যাও।

অথচ আমি ছুটে পালিয়ে আসতে পারলাম না। মাটির সঙ্গে খুঁটির মতো আমার পা-দুটো নিশ্চল হয়ে আটকে ছিল আমি জানি একটু পরে একটা প্রকাণ্ড সাপকে ছুটে যেতে দেখব, তবু আমি নড়তে পারলাম না। আমার মনে হল আমি যেন এক নিষিদ্ধ জগতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সেখানকার সব নিয়ম ভেঙে ফেলেছি। তাই চারধারে অস্থির আলোড়ন জেগেছে আমাকে কেন্দ্র করে।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। আবার কখন যে বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম কিছুই আমার মনে নেই।

॥ ৬ ॥

সিধুমামা এলেন পরদিন সকালে। হাতির পাল চলে গেছে দক্ষিণে। আপাতত ভয়ের কোনো কারণ নেই। সিধুমামা বললেন যে দলে আঠারো থেকে বিশটা হাতি ছিল। একটা দাঁতাল হাতিও ছিল।

জানলা দিয়ে সকালের রোদ্দুর এসে পড়েছে ঘরে। আজ আকাশ মেঘমুক্ত। সিধুমামা চা খাচ্ছিলেন চেয়ারে বসে। আমি দু হাত পেছনে তুলে শরীরের আড় ভাঙলাম।

সিধুমামা আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। বললেন, "কী হল, এনিথিং রং?"

আমি বললাম, "না, তেমন কিছু নয়।"

"তবে ?"

আমি হেসে বললাম, "একা-একা সময় কাটছে না।"

সিধুমামার মুখের রেখা সহজ হল। বললেন, "কলকাতার মতো বিজি লাইফ এখানে কোথায় পাবি ? এখানকার জীবন অন্যরকম।"

আমি বললাম, "আপনি বলেছিলেন থ্রিল আর অ্যাডভেঞ্চারের কথা ?"

আমার কথা শুনে সিধুমামা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামালে বললেন, "তোর মনে আছে দেখছি, অ্যাঁ ? ঠিক, ঠিক। ঠিক কথা বলেছিস। তা হলে—।" সিধুমামার কী যেন মনে পড়ল। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আজ তো চর্তুদশী। আজ রাতে তোকে নিয়ে যাব এক জায়গায়।"

"কোথায় ?"

"ভয় পাবি না তো ? ফুল অব থ্রিল অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চার।"

"কোথায় নিয়ে যাবেন ?"

"চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে। বহুদিনের পুরনো মন্দির। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছু দূর যেতে হবে। হুঁ ?"

চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরের কথা শুনেছিলাম হরিচরণের মুখে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী, নদীর ধারে শ্মশান, শ্মশান থেকে একটু দূরেই চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। এ অঞ্চলের মানুষেরা ভীষণ ভয়-ভক্তি করে ওই দেবীকে।

এমন একটা মন্দিরে নির্জন, নিস্তব্ধ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর অন্ধকার রাতে যাবার কথা শুনে ভয়ে গা ছমছম করার কথা। তা ছাড়া হরিচরণ বলেছিল এখন সেখানে শবসাধনা হয়। শবের ওপর বসে তান্ত্রিকরা নানান রকম ভীষণ সাধনা করে। সিধুমামাও নাকি ও-সবের মধ্যে আছেন। তন্ত্রসাধনার নাকি নানান রকম পরীক্ষা চলে। আত্মার অদল-বদল হয়। অথচ আমার সে-রকম কোনো ভয় হল না। বললাম, "হ্যাঁ, আমি যাব।"

সিধুমামা হরিচরণকে ডেকে বললেন, "আজ মাংস রাঁধো। পাঁঠার মাংস।"

হরিচরণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিধুমামা চলে গেলে আমি হরিচরণকে বললাম, "তোমার কী হয়েছে বলো তো হরিচরণদা, আমার সঙ্গে কথাই বলছ না ?"

হরিচরণ বলল, "আমার কিছু হয়নি।"

আমি বললাম, "না, কিছু হয়েছে।"

হরিচরণ বলল, "আমার কিছু হয়নি, হয়েছে তোমার।"

"আমার ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার আবার কী হবে ?"

হরিচরণ কোনো জবাব দিল না। কোনো জবাব দেবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না যেন। কিন্তু আমার রোখ চেপে গেল। বললাম, "কী হল, বললে না আমার কী হয়েছে ?"

হরিচরণ মৃদু গলায় বলল, "আমি চাকরবাকর মানুষ খোকাবাবু, আমার কি সব কথা বলা চলে। বাবু শুনলি শেষ করে ফেলবে।"

আমি বললাম, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমি কাউকেও কোনো কথা বলব না।"

হরিচরণ আমার কাছে সরে এল। ফিসফিস করে বলার মতো করে বলল, "খোকাবাবু, তোমাকে বলতে মানা নেই। আমি থাকতি তোমার কিছু হয়ে গেলে আমার পাপ হবে। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে দেখেই আমার মায়া পড়ে গেছে।"

আমি সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, "কেন, আমার কী হবে ?"

হরিচরণ বলল, "না, তোমার অন্য কিছু হবে না। তোমাকে দাদাবাবু খুব ভালবাসেন। ভাল না বাসলে তাঁর এত

জায়গাজমি কি তোমার নামে উইল করে দেন !"

"আমার নামে উইল করেছেন ?"

"তাই তো জানি ?"

"আমাকে কেন ?"

"তোমাকে ভালবাসেন বলে। শিলিগুড়ির বাড়ি অবশ্য তোমার মামি মানে ওঁর স্ত্রীকে দেবেন। তা স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর তেমন সম্পর্ক নেই। আমি যতদূর জানি ওঁর স্ত্রী এইসব তন্ত্রমন্ত্র মোটেই পছন্দ করেন না, তাই মেয়েকে নিয়ে এক রকম আলাদাই আছেন। চাকরিও করেন একটা, শিলিগুড়ির কোনো ইস্কুলে। বাবুও ঘর-সংসার করতে চান না। ওদের খোঁজখবরও তেমন রাখেন না। দু-মাসে তিন-মাসে একবার গিয়ে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে আসেন।"

আমি বললাম, "আমার কী হবে বললে না ?"

এ-সময় বাইরে হরিচরণের নাম ধরে কে যেন ডাকল। ডাক শুনে হরিচরণ বলল, "ওই এসে গেছে।"

হরিচরণ বাইরে গেল এবং একটু পরেই একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোকটার মুখের দিকে তাকাতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর কেউ নয়, ঘরে এসে ঢুকেছেন সেই ট্রেনের ভদ্রলোক। সুকুমার ভাদুড়ী।

সুকুমার ভাদুড়ী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কী, আমাকে চিনতে পারছ তো ?"

আমি বললাম, "না চিনতে পারার কী আছে।"

সুকুমার ভাদুড়ী আবার বললেন, "ঠিক-ঠিক চিনতে পারছ তো ? কোনো অস্পষ্টতা নেই ?"

এ-ধরনের কথায় আমার রাগ হয়ে গেল। কেননা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম উনি মজা করে কোনো কথা বলছেন না। বললাম, "আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ?"

হরিচরণ আর সুকুমার ভাদুড়ী চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। সুকুমার ভাদুড়ী কঠিন গলায় বললেন, "ঠিক ভাবেই কথা বলছি। তোমাকে ধরে আচ্ছা করে পেটানো উচিত।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে ?"

"তার মানে ?" সুকুমার ভাদুড়ী হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার গালে প্রচণ্ড শক্তিতে একটা চড় মেরে বললেন, "তার মানে এই।"

চড় খেয়ে আমার শরীরের মধ্যে এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সুকুমার ভাদুড়ী বলিষ্ঠ চেহারার শক্ত-সমর্থ মানুষ, আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। ওঁর হাতের আঘাত আমার লাগবারই কথা। আমার চোখের সামনে একরাশ অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন। কয়েক মুহূর্তমাত্র। তারপর কোথা থেকে হালকা আলো বাতাসের মতো ভেসে এল। উড়িয়ে নিয়ে গেল জমাট ধোঁয়ার মতো সেই অন্ধকারকে।

এরপরেই সুকুমার ভাদুড়ী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আমাকে হঠাৎ চড় মারার পরই তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মনে হল আমাকে এ-ভাবে আঘাত করার তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। খুব মোলায়েম গলায় বললেন, "আমি ভীষণ দুঃখিত তপু। তুমি খুব ভাল ছেলে। রিয়েলি এ শুড বয়।"

নিমেষের মধ্যে কী হয়ে গেল। সুকুমার ভাদুড়ী বিনা কারণে আমাকে মারলেন, অথচ আমি ভীষণ রাগ করে চিৎকার করে উঠতে পারলাম না। আমি পড়াশোনা করি, খেলাধুলা করি, আমার স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। কেউ অন্যায় করলে আমি তাকে ছেড়ে দেব না। কিন্তু কেন যেন মনে হল সুকুমার

# ফেনা আর ফেনা
# টাটকা তাজা...
# স্বাস্থ্যে ভরপুর!

## স্বস্তিক
# নিম সাবান

নিম আর কর্পূরে মিলিয়ে তৈয়ার
তাইতো স্নানের মজা, ফূর্তির জোয়ার!

shilpi dm 5A/83 ben

ভাদুড়ী কোনো অন্যায় করেননি।

আমি আহত গলায় বললাম, "কিন্তু আমি কী দোষ করেছি?"

সুকুমার ভাদুড়ী সস্নেহে বললেন, "না না, তুমি কোনো দোষ করোনি। বললাম তো তুমি খুব ভাল ছেলে।"

"তবে আমাকে মারলেন কেন?"

হরিচরণ এতক্ষণ সব দেখছিল। মনে হল ও ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছে, ভয়ও পেয়েছে কিছু। আমার কাছে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়াল। তারপর বলল, "ওঁর কোনো দোষ নেই খোকাবাবু। আমিই ওঁকে ডেকে এনেছি। তোমার ভালর জন্যই—।"

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন,"এখানে তো সব কথা বলা যাবে না, তোমার মামা এসে পড়তে পারেন। পরে বলব। সব কথাই তোমাকে বলব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো ভৈরবানন্দ তোমাকে একটু সম্মোহন করেছিলেন। আজ হয়তো পুরোপুরি হিপনোটাইজ করবেন। মন্ত্রের সঙ্গে এক নিশ্বাসে তোমার নাম ধরে ডাকবেন।"

বললাম, "কেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন কেন?"

"এ সব তুমি ভাল করে বুঝবে না। তন্ত্রশাস্ত্রে ওকে বলে সম্মোহনী ডাক। ওই ডাক একবার শুনলে তুমি বিশ্বসংসার ভুলে যাবে। এমন-কি তোমার মা-বাবাকেও। তখন তুমি তোমার মতো থাকবে কিন্তু চলবে ভৈরবানন্দের ইচ্ছেমতো।"

আমার সমস্ত শরীরে একটা বিষাক্ত শীতল সাপ যেন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠল। আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি কি এতকাল ঘুমিয়ে ছিলাম। সিধুমামা এসব কী করছেন?

সুকুমার ভাদুড়ী বারবার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর হয়তো ভয় হচ্ছিল কোনো এক সময় সিধুমামা এসে যাবেন! সেটা বুঝতে পেরে হরিচরণ বলল, "এখন দাদাবাবু আসবেন না। এই একটু আগেই তো বেরুলেন। আর এলেও অনেকদূর থেকে জিপগাড়ির শব্দ শোনা যাবে।"

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "আমি তোমাকে চড় মেরেছি তোমার মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনতে, তোমাকে এক গভীর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে। হরিচরণ আমাকে খবর দিয়েছিল কাল দুপুরে। নিউ জলপাইগুড়িতে খুঁজে-খুঁজে আমার গ্যারেজ বের করেছে। বুড়োমানুষ, অনেকদিন এখানে থেকে অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে। পাঁচজনের মুখে পাঁচ কথা শুনেছে। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দিয়েছে। সব শুনে বুঝলাম একটা সর্বনেশে ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। ভৈরবানন্দকে বাড়িতে ডেকে এনে তোমার মামা তোমাকে দেখিয়েছেন। ভৈরবানন্দ তোমাকে দেখে খুশি হয়েছেন, সম্মতি দিয়েছেন তোমার মামাকে।"

আমি সভয়ে বললাম, "কিসের সম্মতি?"

সুকুমার ভাদুড়ী ম্লান মুখে হাসলেন। বললেন, "সিদ্ধেশ্বরবাবু তো তোমার মামা, খুব দূর সম্পর্কের মামা, তাই না? বছর দু-তিন কেবল তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তাই না? উনি তোমাকে তাঁর এই বিরাট সম্পত্তি দিচ্ছেন কেন জানো?"

"না।"

"অবশ্য এ সব তোমার জানার বয়েস এখন নয়। জীবনের ভাল দিকটা এখন দেখবে, ভাল জিনিস জানবে। তোমার সঙ্গে এ সব বীভৎস বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। কিন্তু উপায় নেই। তোমাকে জানতে হবে। যে ভাবেই হোক সম্প্রতি সিদ্ধেশ্বরবাবু জেনেছেন যে, তিনি খুব বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তোমাকে এখানে কয়েকদিন ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। এ লাইনে আমি কিছুটা

ইন্টারেস্টেড বলে এর-ওর কাছে ব্যাপারটা জেনে গেছি।"

"কিন্তু আমাকে এখানে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "সম্ভবত তন্ত্রযোগে তোমাকে বহুদিন আচ্ছন্ন করে রাখবার জন্যে। তোমার মধ্যে উনি কি খুঁজে পেয়েছেন জানি না। তবে কোনো কারণে তোমাকে ওঁর খুব ভাল লেগে গেছে। যা হোক, তুমি হিপনোটাইজড হয়ে থাকবে। কেউ সে কথা জানতে পারবে না। তারপর উনি যে দিন মারা যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনিময় ঘটে যাবে। তুমি থাকবে, কিন্তু তোমার মধ্যে থাকবে সিদ্ধেশ্বরবাবুর আত্মা। সেই আত্মার ইচ্ছাধীন হয়ে তুমি চিরদিন চলবে। এই ধন-দৌলত তোমার মধ্যে থেকে তোমার মামাই দেখাশোনা করবেন। এ সব হয়তো বুজরুকি। কিন্তু তুমি কিংবা আমি বিশ্বাস করি আর না করি, ওরা বিশ্বাস করে।"

অজানা একটা ভয় লম্বা হাত বাড়িয়ে আমাকে চেপে ধরল। ডিসেম্বরের বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস যেন কাঁটাতারের মতো আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমার গলা শুকিয়ে এল।

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "আমি এখনই তোমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বলতাম, কিন্তু তুমি তা পারবে না। চৌকিদারের চোখ এড়িয়ে তোমার যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া তাতে হরিচরণও মুশকিলে পড়তে পারে। এখান থেকে দশ মাইল দূরে পাকা রাস্তা। মাঠ-জঙ্গল পার হতে হবে। আমি সাইকেলে অন্য শর্টকার্ট রাস্তায় এসেছি। সে পথে তুমি যেতে পারবে না।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তা হলে আমি কী করব?"

সুকুমার ভাদুড়ী জামার পকেট থেকে কাগজে মোড়া কী একটা বের করলেন। কাগজ খুলে জিনিসটা আমাকে দেখালেন। ছোট একটা ত্রিশূল। বললেন, "এটা তুমি রাখো। এটা কাছে থাকলে তোমার কোনো ভয় নেই। কেউ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। ভৈরবানন্দ নিচুস্তরের মতলববাজ তান্ত্রিক। তান্ত্রিক না বলে ওকে কাপালিক বলাই ভাল। এটা যার কাছ থেকে এনেছি তিনি একজন মহাপণ্ডিত এবং খুব বড় সাধক। তাঁর নামটা তোমাকে ইচ্ছে করেই বলছি না।"

তখনই দূরে কোথাও গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সুকুমার ভাদুড়ী আর বসলেন না। গাড়ির শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় শুধু বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই। মনের পশুশক্তিকে মানুষের শুভবুদ্ধি চিরকালই জয় করে এসেছে। আমরা থাকতে কোনোরকম অন্যায়, পৈশাচিক কাণ্ড ঘটতে দেব না। পরে দেখা হবে।"

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সুকুমার ভাদুড়ীর দ্রুত পায়ে নেমে যাবার শব্দ শোনা গেল।

সেই গাড়ির শব্দ কিন্তু অন্য কোনো গাড়ির, সিধুমামার জিপের নয়। সিধুমামা এলেন আরো পরে। সেই দুপুর বারোটার পরে। এসেই বললেন, "তা হলে তপুবাবু, রেডি তো? দেবী চৌধুরানীর বৈকুণ্ঠপুর নিজের চোখেই দেখবে, না কানে শুনেই চলে যাবে?"

সেই সকাল থেকে আমি অনেকক্ষণ ভেবেছি। ভেবেছি হরিচরণ যা বলেছে, সুকুমার ভাদুড়ী যা বললেন, সব কথাই। কলকাতা শহর হলে এ-সব আজগুবি, আষাঢ়ে গল্প বলে অবিশ্বাসের হাসি হাসা যেত। কিন্তু এখানে এই জনমানবহীন ভূখণ্ডে, গহন জঙ্গলের ধারে, গাছের পাতার শিরশিরে আওয়াজে, কোনো ছায়া-ছায়া মেঘলা শীতের দুপুরে নানা সংস্কার আর বিশ্বাসের জগতে সব কিছু গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বললাম, "না। বৈকুণ্ঠপুর

জঙ্গল আর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির নিজের চোখেই দেখে যাব।"

সিধুমামা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "শাবাশ!"

॥ ৭ ॥

সারাদিনই আকাশ মেঘলা ছিল। শীতের দুপুরকে সেই বর্ষাকালের মতো মনে হচ্ছিল। বিকেলের দিকে হালকা মেঘ গাঢ় হল, কালো হয়ে ছড়িয়ে গেল সমস্ত আকাশে। শীতের ছোট বিকেল কখন এল আর কখন যে গেল টেরই পাওয়া গেল না। সন্ধে হতেই চারধার ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চা খেতে খেতে সিধুমামা বললেন, "রাত্রি নটার পরই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

সিধুমামা বেরিয়েছিলেন, ফিরে এলেন নটার একটু আগেই। সঙ্গে ভৈরবানন্দ। ভৈরবানন্দ ঘরে ঢুকে আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্যদিকে সরে গেলাম। ভৈরবানন্দ গম্ভীর গলায় বললেন, "ব্যাপারটা তো অদ্ভুত ঠেকছে!"

মামা বললেন, "কোন্ ব্যাপারটা?"

ভৈরবানন্দ সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, "সিদ্ধেশ্বর তাড়াতাড়ি করো।"

সিধুমামা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। তারপর সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে কী-সব নিলেন। হাতে একটা বড় টর্চ নিলেন। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার খাওয়া-দাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল।

সিধুমামা আর ভৈরবানন্দ জিপের সামনের আসনে বসলেন। সিধুমামাকে তো বসতেই হবে। উনি গাড়ি চালাবেন। আমি পেছনের আসনে বসলাম। দেখলাম ভৈরবানন্দেরও তাই ইচ্ছে। বললেন, "ঠিক আছে। ও পেছনের আসনেই বসুক।"

সিধুমামা চুপ করে শুধু মাথা নাড়লেন। সিধুমামাকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছিল। গাড়ি যখন চলতে শুরু করল তখন দেখলাম ভৈরবানন্দ নিচু গলায় সিধুমামাকে কী যেন বললেন। আমাকে দেখেই যে উনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, সেই গম্ভীর হবার কারণটাই বোধহয় সিধুমামাকে বললেন। সিধুমামা শুনতে শুনতে একবার পেছন ফিরে আমাকে দেখলেন, একবার ঘাড় কাত করলেন, একবার মাথা নেড়ে কী যেন বললেন।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি কাঁচা রাস্তায় ঢুকল। বুঝলাম বৈকুণ্ঠপুর রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকে পড়েছি আমরা। প্রথমে ঝোপঝাড়, দুচারটে গাছ, তারপরেই হুড়মুড় করে এসে পড়ল গভীর জঙ্গল। আমি কোনোদিন জঙ্গলেই আসিনি, রাত্রে তো নয়ই। আমি অবাক হয়ে সেই নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হল পেছনের অন্ধকার জঙ্গলে একজোড়া নীল আলো যেন জ্বলে উঠল। আলো নয়, জ্বলছে চোখ। শুনেছিলাম রাত্রির অন্ধকারে বন্যপ্রাণীদের চোখ ওইভাবে জ্বলে। একটু পরে চোখদুটো আর দেখা গেল না। কিছুদূর যাবার পর দেখলাম ঠিক সেইরকম এক জোড়া চোখ জ্বলছে। জ্বলেই আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। যেন দুটো জ্বলন্ত নীল চোখ আমাদের পেছন পেছন ছুটে আসছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সহসা এত অন্ধকারেও আমার কেন যেন মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়াল লাফ দিয়ে দিয়ে আমাদের পেছনে আসছে। সেই বেড়ালটা নাকি!

অনেকক্ষণ আর কিছুই দেখলাম না। শুধু গাছ আর গাছ। গভীর গহন বহুদূর ছড়ানো বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। দেখতে দেখতে এক সময় চমকে উঠলাম। বুকটা ধড়াস করে উঠল। স্পষ্টত মনে হল গাড়ির

পেছনে যেন প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসছে একটা মূর্তি। পোড়োবাড়ির সেই বুড়িটা! আলুথালু বেশে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে সেই বুড়ি? নাকি সবটাই আমার দেখার ভুল!

একসময় আমাদের গাড়ি থেমে গেল। আমি চোখ খুলে দেখলাম। মনে হল কিছু দূরে জঙ্গলের ধারে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। নদীর সামনে কিছুটা ফাঁকা জংলা জমি। সেই জমিতে গাড়ি থামল। সামনে একটা চাতালের মতো। বুঝলাম চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরের সামনে আমাদের গাড়ি থেমেছে।

গাড়ি থেকে সিধুমামা আগে নামলেন, তারপর ভৈরবানন্দ, শেষে আমি। আমি নামতেই সিধুমামা গাড়ির হেডলাইটের আলো নিবিয়ে দিলেন। নিকষ কালো অন্ধকারে চারধার ডুবে গেল। তখনই সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল। বোধহয় গাড়ির আলো দেখে ছুটতে ছুটতে এসেছে। তখনো হাঁপাচ্ছিল। সিধুমামা টর্চ জ্বাললেন। আর টর্চ জ্বালতেই আমি লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলাম। ক্ষয়া চেহারা, কালো রঙ, লম্বা টিকালো নাক, ছোট্ট-ছোট্ট ধূর্ত চোখ। প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। একেই সিধুমামার বাড়িতে দেখেছিলাম। মানিকচাঁদ। আমি লোকটাকে না দেখে তার পাশ দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালাম। একটু দূরে একটা জায়গায় আলো জ্বলছে। সম্ভবত মশালের আলো। ওটাই তাহলে সেই শ্মশান। মানিকচাঁদ বোধহয় শ্মশানেই এদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ও একা নয়, আরো কেউ-কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে।

যে সাহস নিয়ে আমি এসেছিলাম, ততক্ষণে তা শেষ হয়ে গেছে। বরং ভয় এসে বুকে বাসা বেঁধেছে। বুঝতে পারছিলাম আমি এক নারকীয় পরিবেশে এসে পড়েছি।

মন্দিরের চাতাল এক-মানুষ উঁচু। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সিধুমামা সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলে বললেন, "এসো তপু। মায়ের মন্দির। আগে প্রণাম করে নেবে।"

টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল অনেক দিনের পুরনো ভাঙা সিঁড়ি। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ে ইঁট বেরিয়ে আছে।

এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। সুকুমার ভাদুড়ীর দেওয়া সেই ত্রিশূলটা আমার পকেটে ছিল। মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিয়ে সেটা কেমন করে যেন পকেট থেকে পড়ে গেল। ঝন্ করে শব্দ হল। বুঝতে পেরেই আমি অন্ধকারে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। সিধুমামা তখন সিঁড়ির দুই ধাপ ওপরে উঠে গেছেন। শব্দ শুনে পেছন ফিরে সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ফেললেন। টর্চের উজ্জ্বল আলোতে চকচক করে উঠল সেই ত্রিশূলটা। সিধুমামার টর্চের জোরালো আলো কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল সেই ছোট ত্রিশূলটার ওপরে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। তখনো বুঝতে পারছিলাম না ত্রিশূলটা কেমন করে পকেট থেকে পড়ে গেল। হয়তো গাড়ির ঝাঁকুনিতে পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল, খেয়াল করিনি।

সিধুমামা উত্তেজিত গলায় বললেন, "কে, কে এখানে এটা ছুঁড়ে ফেলল?"

ভৈরবানন্দ এগিয়ে এসে বললেন, "হুঁ, এটাই সন্দেহ করেছিলাম।"

"কী?" সিধুমামা মুখ দিয়ে একটু অস্ফুট শব্দ করে বললেন।

ভৈরবানন্দ বললেন, "ওরা এখানে এসে পড়েছে। সাধনায় বিঘ্ন দিতে চায়। কিন্তু এটা কেন? এটা তো এখানে আসার কথা নয়।"

সিধুমামা বললেন, "তাই তো, এটা ওদের কাছে যাবে কেন?

বুঝলাম ত্রিশূলটা যে আমার পকেট

থেকে পড়ে গেছে তা এখনো কেউ বুঝতে পারেনি। সবাই অন্য কথা ভাবছে, অন্য কিছু সন্দেহ করছে। সিধুমামা চাতালের ওপর উঠে গিয়ে তখনই মন্দিরের ভেতর টর্চের আলো ফেললেন। আর আলো ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের একটা শব্দ করে পিছিয়ে এলেন। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল মন্দিরের দরজার সামনে বিশাল ফণা তুলে আছে প্রকাণ্ড এক কেউটে। যেন পাহারাদারের মতো মন্দিরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকেও ঢুকতে দেবে না।

তখনই সিধুমামার হাত থেকে আচমকা টর্চটা পড়ে গেল নীচে। সহসা সব অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার হাতড়ে যদিবা আবার টর্চটা পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল সেটা আর জ্বলছে না।

হঠাৎ ভৈরবানন্দ চিৎকার করে উঠলেন, "মাভৈ। সিদ্ধেশ্বর, আর অপেক্ষা করা চলে না। আমি এই মুহূর্তেই সাধনায় বসব। ওরা বাধা দিতে চায়। আমি ওদের শায়েস্তা করব।"

আমার কেন যেন মনে হল গুপ্তধনের যখ বারবার ছুটে আসছে। কোনো কারণে সে অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভৈরবানন্দকে সে বাধা দিতে চায়। সেই কথাই বলছেন ভৈরবানন্দ।

নিস্তব্ধ বনাঞ্চলকে কাঁপিয়ে ভৈরবানন্দ গম্ভীর গলায় আবার চিৎকার করে বললেন, "সিদ্ধেশ্বর, আয়োজন সম্পূর্ণ করো। ত্রিভুবনে কেউ আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। মা ভৈ। জয় মা চামুণ্ডা।"

ভৈরবানন্দের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি উথাল-পাথাল হয়ে উঠল সে ঝড়ের আলোড়নে। গর্জন করে উঠল মেঘ, ঝলসে উঠল বিদ্যুতের চাবুক, মাতাল হয়ে উঠল বাতাস। সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এল। তুমুল বৃষ্টি। ঝড়ের সঙ্গে আকাশটাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কারও কথা শোনা যায় না, কোনো কিছু দেখা যায় না। মন্দিরের ভেতরে দরজার সামনে এক প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ফুঁসছে। এগোনোও যায় না, পিছনোও যায় না, সব কিছু মিলে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ওরা বুঝি চাতালের ওপর উঠল, সাপের ভয় থাকা সত্ত্বেও। ঝড়ের আওয়াজের সঙ্গে ভৈরবানন্দের গলা শোনা গেল, "সাবধান! আজ আমি সাধনায় বসব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের কোনো শক্তিই আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।"

আমি সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। কে যেন আমার কানে কানে বলল, "পালাও তপু, পালাও। তোমার সামনে ভীষণ বিপদ। প্রাণের মায়া থাকলে এই সুযোগে পালাও।" সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়োলাম। কিছুই দেখা যায় না, কিছুই চিনি না। দুপাশে গভীর জঙ্গল। শ্মশানের দিকে যেখানে একটু আলো দেখা যাচ্ছিল, সেইদিকে প্রাণপণে ছুটলাম। একবার মনে হল পেছনে কে যেন আমাকে ধরতে ছুটে আসছে।

তখনই আকাশ চিরে লকলকিয়ে উঠল বিদ্যুতের তলোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। সেই আলোর ঝলক আর শব্দ যেন আমাকে লক্ষ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাজটা কি তবে আমার ওপরেই পড়ল? আমি মাটির ওপর মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হল আমি অন্ধ হয়ে গেছি, আমার সমস্ত শরীর ঝলসে গেছে। সেই অশান্ত ঝড় আর বৃষ্টির মধ্যে জংলা মাঠের মধ্যে আমি নিস্পন্দ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম। তারপর একসময় মুখ তুলে তাকালাম। তাকাতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অনেক দূরে অন্ধকারের বুকের ওপর আলো ফেলে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। নিশ্চয়ই সিধুমামার জিপ। ওরা আমাকে ধরতে আসছে। এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে না গেলে আমাকে ধরে ফেলবে। আমি মরিয়ার মতো অন্ধকারে আবার ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে কিসে যেন প্রচণ্ড ঠোক্কর খেলাম। 'মাগো' বলে চিৎকার করে আমি পড়ে গেলাম।

॥ ৮ ॥

পরদিন সকালে আমার জ্ঞান হতেই দুটো সংবাদ পেলাম। এক, সিধুমামাকে মৃত অবস্থায় চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে পাওয়া গেছে। দুই, ভৈরবানন্দকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আমি সিধুমামার বিছানায় শুয়ে ছিলাম। ঝড়ের সময় অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে আমি নাকি কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে জায়গাটা শ্মশানের কাছেই এবং আমি যেখানে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম সেখানে একটা বিরাট পাথর পড়েছিল। সবার ধারণা ওই পাথরের আঘাত পেয়েই আমি পড়ে গেছি। ওই অবস্থায় অবশ্য বেশিক্ষণ ছিলাম না, সুকুমার ভাদুড়ী পুলিশের সঙ্গে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আমাকে উদ্ধার করে আনেন। আমাকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি আনার পর স্থানীয় হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। ডাক্তার এসে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে গেছেন। ভয়ের কোনো কারণ নেই।

"কিন্তু সিধুমামা?" আমি তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সিধুমামা নেই। সমস্তটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হল। হয়তো সেই দুঃস্বপ্ন এখনো দেখছি। আসলে কিছুই হয়তো হয়নি। "হরিচরণদা, সিধুমামা কোথায়?"

হরিচরণ মাথা নিচু করল। ওর চোখদুটো বুঝি ছলছল করে উঠল। সুখে-দুঃখে দীর্ঘদিন সিধুমামার সঙ্গে আছে। সিধুমামার পরিবারেরই একজন লোক হয়ে গিয়েছিল। দুঃখটা ওর বুকেই বাজছে বেশি। "উনি মারা গেছেন সাপের কামড়ে।" হরিচরণ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল।

সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে সেই বিষধর সাপের বিশাল ফণাটা ভেসে উঠল। মূর্তিমান মৃত্যুর মতো মন্দিরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার শরীর কেঁপে উঠল।

হরিচরণ আবার বলল, "সবাই তাই বলছে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু আমার মনে হয় সাপ নয়, যখ। যখই প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদাবাবুর মুখে দেখা গেছে কোনো জন্তু নখ দিয়ে কেটেছে। বেড়াল যেমনভাবে আঁচড় কাটে। খোকাবাবু, আর একজনও কাল মরেছে।"

"কে? কে মরেছে হরিচরণদা?"

"কাল রাতে একটা বুড়ি মরেছে ওই ভাঙা বাড়িটার সামনে। বাজ পড়ে মরেছে।"

আমি চমকে উঠলাম হরিচরণের কথা শুনে। ভয়ে-উত্তেজনায় উঠে বসতে চাইছিলাম, কিন্তু হরিচরণ শুইয়ে দিল। বাইরে দু-চারজন লোকের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। ওরা বোধহয় এখানকার লোকজন। কালকের রাতের দুর্ঘটনার বিষয় আলোচনা করছে। আমি দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সুকুমার ভাদুড়ী ঘরে এসে ঢুকলেন। আমার বিছানার কাছে এসে বললেন "কেমন আছ? অলরাইট?"

আমি বললাম, "সিধুমামা মারা গেছেন?"

সুকুমার ভাদুড়ী নিঃশব্দে আমার বিছানার পাশে বসলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন যেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ,

নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

"কী হয়েছিল ?"

"সাপ। হ্যাঁ, সাপই। সত্যিকারের বিষধর কোনো সাপ। চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে, অনেক দিনের পুরনো ভাঙা মন্দির তো, তার ওপর জঙ্গল, সাপের ছোবলেই তোমার মামার মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টি-ঝড়ের জন্যে হয়তো মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্ধকার রাত, যে টর্চটা পাওয়া গেছে, সেটাও দেখলাম খারাপ হয়ে গেছে। সাপটাকে সম্ভবত দেখা যায়নি। আমি সময়মতো পুলিশে খবর না দিলে তোমারও যে কী দশা হত, ভগবান জানেন।"

আমার মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে সমস্ত ঘটনার স্মৃতি যেন সিনেমার পর্দার মতো ভেসে চলল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার আগের মুহূর্তে যে-আলোটা দেখেছিলাম, সেটা তা হলে পুলিশের গাড়ির আলো। সুকুমার ভাদুড়ী পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসছিলেন সেই গাড়িতে।

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "ওই ভণ্ড তান্ত্রিকটাই সব সর্বনাশের মূল। ওই সিদ্ধেশ্বরবাবুকে এ-সব বদ বুদ্ধি দিয়েছিল। আসলে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ তেমন ছিল না। সরল মনেই এ-সব ব্যাপার বিশ্বাস করেছিলেন। ওই তান্ত্রিকটাই সিদ্ধেশ্বরবাবুর কিছু সম্পত্তি বাগাবার জন্যে সিদ্ধেশ্বরবাবুকে জানিয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর আত্মা অন্য কোনো মানুষের মধ্যে সক্রিয় থাকবে। এটা অবশ্য আমার ধারণা এবং কিছুটা শোনা। আর আমার মনে হয়, এই ধারণা আর শোনা কথায় অনেকখানি সত্য আছে। আত্মার অদলবদল, একজনের আত্মা অন্যের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া, এ সব আসলে ধাপ্পাবাজি। সিদ্ধেশ্বরবাবুর অবর্তমানে ভৈরবানন্দ লুকানো জায়গা থেকে ওই সোনা কিংবা অন্য কিছু বের করে নিত। তা-ছাড়া ভৈরবানন্দ তোমার মামার মনে এই ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি সঠিক জানি না এই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার কোনো চেষ্টা ছিল কিনা ঐ তান্ত্রিকের তরফ থেকে। হয়তো—যাকগে, এখন ব্যাপারটা পুলিশের হাতে। ওরাই দেখবে। মোটকথা এ-সব তান্ত্রিক আর কিছু না পারুক, নানান রকম বোলচাল দিয়ে মানুষের চারপাশে একটা মায়াজাল বানিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে সিদ্ধেশ্বরবাবু তো মানুষ হিসেবে খারাপ লোক ছিলেন না, পড়াশোনাও আছে, তিনি এই বুজরুকিতে মজলেন কেন।"

আমি এতক্ষণ পরে বললাম, "কিন্তু ওই বুড়িটাকে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর একটা বেড়াল, আপ—।"

মিঃ ভাদুড়ী বললেন, "ওই ভাঙা বাড়িতে সত্যিই একটা বুড়ি থাকত। যখ-টখ নয়, সত্যিকারের রক্তমাংসের বুড়ি। বুড়িটা পাগলি ছিল। হয়তো ওর সঙ্গে কোনো বেড়াল-টেড়াল থাকত। রাত-বিরেতে পাগলি বুড়িটা ছোটাছুটি করত। এমনিতে এ-সব গ্রাম্য পরিবেশে মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে অনেক আগে থেকেই। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই অন্যরকম মনে হয়। আর সাপ ? এ-সব জঙ্গুলে দেশে সাপ তো হামেশাই দেখা যায়। আসলে কী জানো, তন্ত্রসাধনা খুব উঁচুদরের সাধনা। প্রকৃত সাধক এর মধ্যে দিয়ে সুস্থজীবনের সন্ধান করেন, কিন্তু নিচুস্তরের মানুষের হাতে তা সর্বনাশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।"

আমি তবু বললাম, "কিন্তু ওই বুড়িকে আমি সত্যিই যে গাড়ির পেছনে ছুটতে দেখেছি ?"

সুকুমার ভাদুড়ী হাসলেন, "হ্যালুসিনেশন।"

হ্যালুসিনেশন মানে আমি জানি। বিভ্রম। অর্থাৎ কিনা ভুল দেখেছি আমি। আমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল।

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "অন্ধকারে বাইরের কিছুই তুমি দেখোনি তপু, দেখেছ মনের কোনো ছবিকে। আচ্ছা, তুমি চোখ বোজো তো—।"

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "এবার তোমার মায়ের মুখটা ভাবো তো, ভাল করে ভাবো।"

আমি চোখ বন্ধ করে মা'র মুখ ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে একটু পরে সত্যি-সত্যি মা'র মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মা যেন উদ্বিগ্নমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই স্টেশনে আসার আগে মা'র যে মুখ দেখেছিলাম অবিকল এক।

আমি চোখ খুললাম। সিধুমামার বাড়ি, হরিচরণ, সুকুমার ভাদুড়ী, জানলার বাইরে শীতের সকাল, লোকজনের কথাবার্তা।

ঘরের মধ্যে পুলিশের পোশাক-পরা একজন ঢুকলেন। পরে শুনেছিলাম উনি রায়গঞ্জ থানার ও সি। দারোগাবাবু আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "তুমি বিনয় ব্যানার্জির ছেলে? ইনকাম-ট্যাক্সের বিনয় ব্যানার্জি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"এই দেখ, তুমি বিনয়ের ছেলে এতক্ষণে জানলাম। হরিচরণ থানায় তোমার বাবার পরিচয় দেওয়ায় তখনই সন্দেহ হয়েছিল। আরে বিনয় আর আমি তো ক্লাসফ্রেণ্ড। মালদাতে একই কলেজে পড়তাম। জলপাইগুড়িতে তোমরা যখন ছিলে তখন তোমাদের বাড়িতেও গেছি একবার।"

আমি ভাল করে দারোগাবাবুর মুখ দেখে মনে করার চেষ্টা করলাম এঁকে কোনোদিন আমাদের বাড়িতে দেখেছি কি না।

"চিনতে পারছ না?" দারোগাবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "সাদা পোশাকে ছিলাম তখন। পুলিশের ড্রেসে সাদা পোশাকের লোককে চেনা কঠিন।"

সুকুমার ভাদুড়ী বললেন, "তা হলে তপু আপনার বন্ধুর ছেলে?"

"বন্ধু মানে? বুজম ফ্রেণ্ড!"

"ভাগ্যিস ঠিক-ঠিক সময়ে আপনি পৌঁছেছিলেন।"

দারোগাবাবুর মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল। বললেন, "কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুর মৃত্যুর পর। ওই ভৈরবানন্দ,নাকি কাপালিকটাকে বহুদিন ধরে হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে লোকটা স্মাগলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে। আপাতত কী চার্জে আটকানো যায় সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ওর চেলাদুটো দু-একটা চড় থাপ্পড়েই অনেক কথা বলে ফেলেছে। আর একটা ইমপর্ট্যাণ্ট পয়েণ্ট, সিদ্ধেশ্বরবাবুর শরীরে কিছু কাটা-কাটা আঘাতের চিহ্ন আছে; সিদ্ধেশ্বরবাবু সম্বন্ধে কী বলব! ভাল লোক খারাপ পথে গিয়েছিলেন, শাস্তিও পেয়েছেন। ক্রাইম ডাজ নট পে।"

দারোগাবাবু উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাই হোক না কেন, তোমাকে কনগ্রাচুলেশন্স। অনেক সম্পত্তির মালিক হচ্ছ, অ্যাঁ?"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমি আর এখানে একটুও থাকব না। আমি চলে যেতে চাই কাকাবাবু।"

তখন আমার কারও কথা মনে হচ্ছিল না। কোনো লাভ-ক্ষতি-লোভ কিছুই আমার মনে হচ্ছিল না। আমি আকুল হয়ে শুধু মা'র কথা ভাবছিলাম। মার কথা, বাবার কথা, দিদির কথা, আমাদের বাড়ির কথা।

পাখির মতো যদি আমার দুটো ডানা থাকত, আমি সেই মুহূর্তেই উড়ে চলে যেতাম!

ছবি : অনুপ রায়

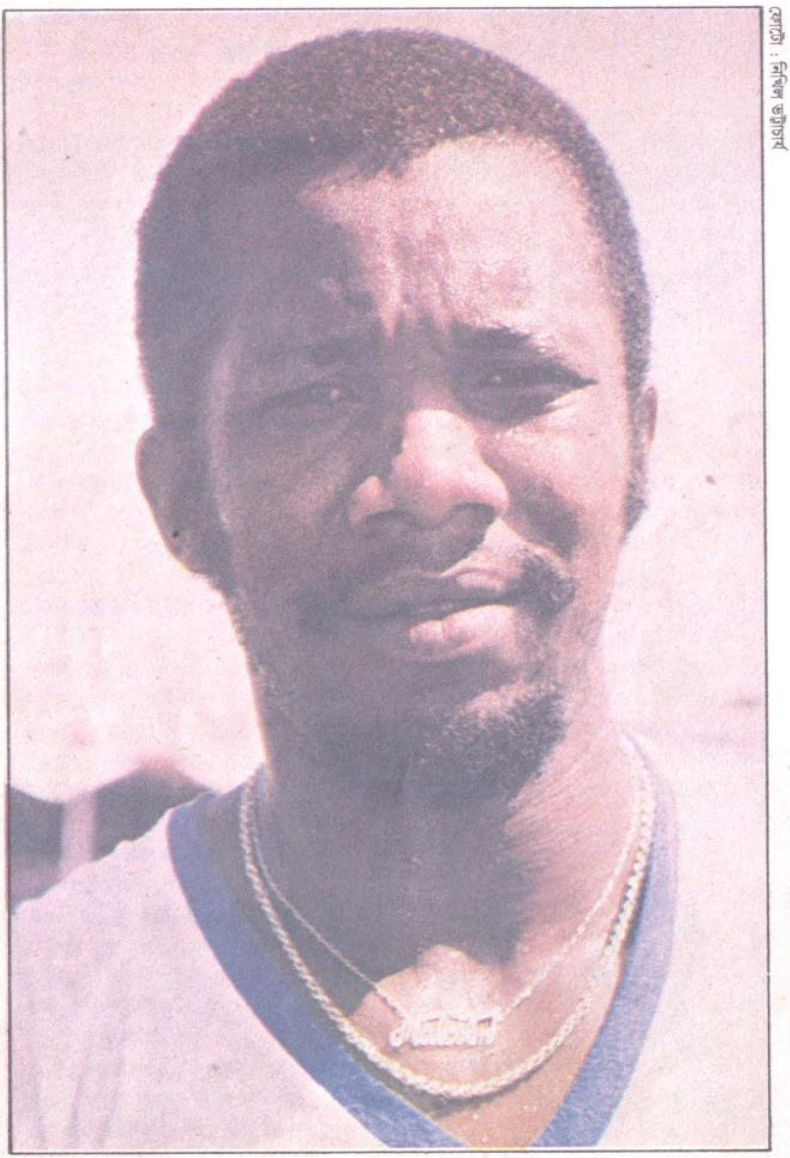

ম্যালকম মার্শাল

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

# কানপুরে ভারত ভেঙে পড়ল

## মণি শর্মা

ভারতের মাটিতে পা রেখে লয়েড বলেছিলেন, "এই সিরিজ জেতার চেষ্টা করব।" গত জুন মাসে বিশ্বকাপ ফসকে যাওয়ার ঘটনা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের কতটা ক্রুদ্ধ করে রেখেছে, লয়েডের কথার সুরে তা বিশেষ টের পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেল কানপুরে—মার্শালের বলে। প্রথম টেস্টে বস্তুত ভারতের ঘাড় ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন ম্যালকম মার্শাল। সেই ঝাঁকানিতে দুই ইনিংসে টুপটাপ করে পাকা ফলের মতো খসে পড়েছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। নিধন-যজ্ঞ শেষ করে প্রাণ খুলে হেসেছেন মার্শাল-হোল্ডিং।

নির্জীব পিচে টসে জিতে ক্লাইভ লয়েড ব্যাট করতে চাইলেন। উদ্দেশ্য, ভারতের ভোঁতা বোলিংকে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করা এবং চতুর্থ ইনিংসকে এড়িয়ে যাওয়া। স্পিনারদের সাহায্যকারী হিসেবে কানপুর পিচের যথেষ্ট সুনাম আছে। লয়েড বোধহয়

মদনলাল (একা লড়েছিলেন)

ভাবতেও পারেননি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট ধরতে হবে না।

গোড়ায় অল্প রানে হেনেসকে হারাবার পর রিচার্ডস এসে পরম আনন্দে ব্যাট ঘোরাতে লাগলেন। রানের গতি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করল। রিচার্ডসের 'ডোন্ট কেয়ার' ভঙ্গি এবং মারের বহর দেখে মনে হল, সেঞ্চুরি হবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২৪ রানের মাথায় তিনি আউট হলেন। গোমস (২১) ভাল খেলতে পারেননি। কেমন একটা ত্রস্ত ভাব, অস্বস্তিতে ভরা ইনিংস। পত্রপাঠ বিদায় নেন লোগি। লয়েডও (২৩) প্রত্যাশিত খেলা খেলতে পারেননি। মারমুখী গ্রিনিজকে সঙ্গ দিলেন দুজৌ (৮১) এবং মার্শাল (৯২)। মার্শাল কিছুটা চঞ্চল, কিন্তু দুজৌ সংযমী হয়ে খেলেছেন আগাগোড়া। মাত্র আট রানের জন্য শতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন মার্শাল। আর ছ' রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি ফসকে গেছে গ্রিনিজের হাত থেকে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪৫৪ রানের উত্তরে, ব্যাট করতে নেমে দুটি ইনিংসেই ভারত শোচনীয়ভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতে মার্শাল-হোল্ডিংয়ের কৃতিত্ব তো আছেই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীনতা। প্রথম ইনিংসেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কম রানের নয়া রেকর্ড গড়তে চলেছিল ভারত। বুক চিতিয়ে লড়াই করে মদনলাল (৬৩) এবং বিনি (৩৯) ভারতকে ২০৭ রানে পৌঁছে দেন। সুতরাং ফলো-অন। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। মার্শাল-হোল্ডিংয়ের বলে মূর্ছা ও পতন। এবারে ইনিংস শেষ হল আরও কমে, ১৬৪ রানে। বেংসরকর (৬৫) ও রবি শাস্ত্রীর (৪৬) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কী হত ভাবতে গা শিরশির করে।

এক ইনিংস ও ৮৩ রানে জিতে লয়েড দিল্লির জন্য গোঁফে তা দিচ্ছেন।

# মঞ্জরেকর চলে গেলেন

## অশোক রায়

বোলাররা মাথা খুঁড়েও ব্যাট-প্যাডে কখনও ফাঁক খুঁজে পায়নি। অথচ মৃত্যুর বলটা কত সহজে জীবনের ইনিংসে ছেদ টেনে দিয়ে গেল। মৃত্যুর কাছে হার মানলেন বিজয় মঞ্জরেকর, মাত্র ৫২ বছর বয়সে।

ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞরা সবাই বলেন, মঞ্জরেকরের ক্রিকেট-ব্যক্তিত্ব আবির্ভাবের দিনটি থেকেই নির্ভরতা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটকে। চোখ ছিল তীক্ষ্ণ। টেকনিক, ফুটওয়ার্ক, সেন্স অব্ টাইমিং ছিল নিখুঁত। এর সঙ্গে 'সাহস' শব্দটা যুক্ত হওয়াতে মঞ্জরেকারের ব্যাটিং ক্লাসিক পর্যায়ে চলে আসে।

শীত নয়, ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাঁপিয়েছিলেন ভয়ংকর গতির ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান। অথচ লিডসে সেই বিধ্বংসী ট্রুম্যানের বেয়াড়াপনার জবাব দিয়েছিলেন মঞ্জরেকর ১৩৩ রানের একটি অসমসাহসী ইনিংস খেলে। বাম্পারের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও ভারতীয়দের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, বুকে সাহস থাকলে 'হুক' মেরে যে-কোনো ফাস্টবোলারকেই শাসনে আনা যায়। সত্যি বলতে কী মঞ্জরেকর ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবার পরে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে হুক শটটা যেন হারিয়ে গেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে হল-গিলক্রিস্ট নামের দুই পেস-তাণ্ডব যখন ভারতের বিভিন্ন মাঠে আগুন ছিটকে দিচ্ছেন তখন ইডেনের বুকে একটি বিপর্যস্ত ভারতীয় দলের পক্ষে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে

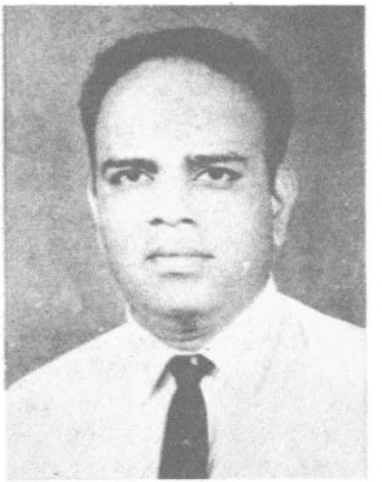

*বিদায়, মঞ্জরেকর*

দাঁড়িয়ে হিংস্র পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছিলেন বিজয় মঞ্জরেকর। পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেও একক পরাক্রমের গৌরবটুকু সেদিন ইডেনে সংবর্ধিত হয়েছিল। মঞ্জরেকরের সেরা ব্যাটিং-নমুনাটি ১৯৬১-৬২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। সিরিজে ৫৮৬ রানের নজিরটি ওখানকার ভারতীয় রেকর্ড হিসেবে চিহ্নিত ছিল। প্রয়োজনে উইকেটকিপারের দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

ক্রিকেট মঞ্জরেকরকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। আবার এই ক্রিকেট থেকেই গভীর দুঃখও তিনি পেয়েছেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে সেঞ্চুরি করার পরে যখন তিনি ভারতীয় টেস্ট টিম থেকে বাদ পড়েন তখন ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় বলেছিলেন—'সেঞ্চুরি করার পরেও যখন আমি বাদ পড়লাম তখন হয়তো ক্রিকেটের কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

# দিল্লিতে মার্শালের মোকাবিলা

## মণীশ মৌলিক

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দিল্লির ফিরোজ শা কোটলাতে সুনীল মনোহর গাওসকর ২৯তম সেঞ্চুরিটি হাঁকিয়ে প্রবাদপুরুষ ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে দিলেন। বাঙ্গালোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পরে ভারতবাসীরা মুখিয়ে ছিল পরবর্তী সেঞ্চুরির জন্য। পাকিস্তানের সঙ্গে বাকি দুই টেস্টে সাধ পূর্ণ হল না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মার্শাল ভয়ংকর বোলিং করে গিলে ফেললেন ভারতীয় দলকে। ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে গেল ভারত।

দিল্লিতে খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্শালের মোকাবিলায় তৎপর হয়ে

*গ্রিনিজ (কানপুরে মারমূর্তি)*

ফোটো : পাবলিক ইমেজ

উঠলেন 'লিটল মাস্টার'। গাওসকরের এই ধরনের খেলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব কম। ফলে, টেলিভিশনে এঁটে-যাওয়া চোখ এবং রেডিওতে পড়ে-থাকা কান একই সঙ্গে আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় শিহরিত হয়ে উঠল। কিন্তু অবিচলিত ছিলেন সানি। সম্ভবত, কানপুরের প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল না। হুক, কাট, পুল, ড্রাইভের বন্যা বয়ে গেল মাঠে। রক্তাক্ত হল ম্যালকম মার্শালের বোলিং। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকি বোলাররাও বাদ গেলেন না। ৭৮ মিনিটে সানির ৫০ রান লয়েডের কপালে চিন্তার ছাপ ফেলে দিল। প্রতিজ্ঞায় স্থির গাওসকর তাঁর জীবনের ২৯তম শতরানটি পূর্ণ করলেন মার্শালকে অন ড্রাইভে একটি বাউণ্ডারি মেরে।

২৯টির মধ্যে সানি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সব চাইতে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন। এক ডজন। তার মধ্যে দুটো ডবল সেঞ্চুরিও রয়েছে। আরেকটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ক্রিকেটের পিতৃভূমির বিরুদ্ধে তিনটি শতরানও হাঁকিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি করে, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি ও শ্রীলংকার বিরুদ্ধে একটি সেঞ্চুরি করে সানি এখন অপেক্ষা করছেন তাঁর ত্রিশতম সেঞ্চুরির জন্য। ১২১ রানের ইনিংসটির পর গাওসকরকে অভিনন্দন জানিয়ে ডন ব্রাডম্যান বলেছেন, "সুনীল একজন বিরাট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেটের অলংকার।" কিন্তু ব্রাডম্যানের সমানসংখ্যক সেঞ্চুরি করেও গাওসকর বলেছেন : ব্রাডম্যানের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না।

দিলীপ বেংসরকর প্রায় চুপিচুপি

গাওসকর (সেঞ্চুরির সংখ্যা ২৯)

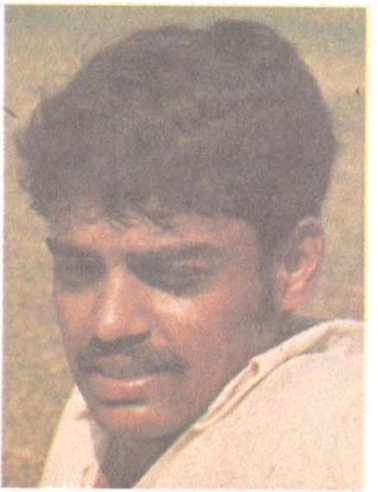

বেংসরকর (দিল্লিতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ)

নিখুঁত একটা সেঞ্চুরি করে নিয়েছেন। সানিকে নিয়ে সবাই তখন মাতোয়ারা বলে বেংসরকরকে খুব চোখে পড়েনি। কিন্তু মনে রাখার মতো ইনিংস খেলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জীবনের সর্বোচ্চ রানও তিনি এখানেই করলেন ১৫৯। এর আগে কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় তিনি ১৫৭ রান করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে রান সংগ্রহে গাওসকর ও বিশ্বনাথের পর এখন বেংসরকরের স্থান।

ভারতের ৪৬৪ রান ; উত্তরে প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারাবার পর রিচার্ডস ও লয়েড দলের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে খেলছিলেন। রিচার্ডস যথারীতি বেপরোয়া খেললেও অধিনায়ক লয়েড ঠাণ্ডা মাথায় দলের ফলো-অন বাঁচাবার চেষ্টায় রত ছিলেন। ব্যক্তিগত ৬৭ রানে লেগ বিফোর উইকেট হয়ে রিচার্ডস ফিরে যান। অল্পসময়ে রিচার্ডসের মতো খেলে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। এরপর লোগি ও লয়েড মিলে দলকে বিপন্মুক্ত করতে ধৈর্য ধরে খেলতে থাকেন। অবশেষে লোগি যখন আউট হন তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনশোর কোটা পেরিয়ে গেছে। লোগির ব্যক্তিগত স্কোর চমৎকার ৬৩। দায়িত্বপূর্ণ ১০৩ রান করার পর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লয়েড ফিরে যান। ৩৮৪ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফুরিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে ভারত তেমন ভাল খেলতে পারেনি। বেংসরকরের (৬৩) পরে বিনি, শাস্ত্রী ও মদনলাল না দাঁড়াতে পারলে খুব কম রানে শেষ হয়ে যেত ভারতের ইনিংস। সেক্ষেত্রে গোটা খেলা চলে যেত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতের মুঠোয়। ২৩৩ রানে ইনিংস শেষ হওয়ার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানেরা দুই উইকেটে ১২০ রান তুলতে পেরেছেন। ফলে অমীমাংসিত রয়ে গেল দিল্লি টেস্ট।

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর**

**ভক্ত শুধু বড়রা নয়, ছোটরাও**

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে বড়দেরই প্রিয় লেখক তা নয়, ছোটরাও তাঁর কিশোরসাহিত্যের দারুণ ভক্ত। হবে নাই বা কেন। যেমন সুন্দর গল্প তেমনই সুন্দর ভাষা আর বর্ণনাভঙ্গি। শরদিন্দুর যাবতীয় ছোটদের লেখা নিয়ে বেরিয়েছে শরদিন্দু অমনিবাসের চতুর্থ খণ্ডটি। এই একটিমাত্র বইতেই সদাশিবের দারুণ সব কাহিনী, মজার গল্প আর আকর্ষণীয় অন্যান্য লেখা। আরেকটি বই হল, 'ভূমিকম্পের পটভূমি'। দুটি অ্যাডভেনচার কাহিনীর এক অনবদ্য সংকলন এই বইটি। একটি কাহিনীতে একটি নির্জন দ্বীপ আর সেখানকার বাসিন্দা বলতে ছোট্ট একটি মেয়ে ও তার ক্যাঙারু-বন্ধুর গল্প, আরেকটিতে পাঁচশো বছর আগেকার এক যুবরাজ যুবরানীর বহু জন্ম বাদে পুনর্মিলন।

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই**

ভূমিকম্পের পটভূমি ৫-০০
শরদিন্দু অমনিবাস ৪র্থ খণ্ড ৩০-০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

# সোভিয়েত সার্কাস

## অহিভূষণ মালিক

সার্কাস বলতে আমরা কী বুঝি? হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের খেলা। আরও একটা জিনিস—বিরাট এক তাঁবু। কিন্তু ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল রিলেশনসের আমন্ত্রণে যে সোভিয়েত সার্কাস-দলটি খেলা দেখিয়ে গেল তাতে না ছিল জন্তু-জানোয়ার, না ছিল তাঁবু। তাহলেও ন'জনের এই সার্কাস-দলটি যে-সব খেলা দেখাল, সে সবই হাততালি দেবার মতো। এঁরা রুশ দেশের বিখ্যাত সব খেলোয়াড়।

দলনেতার নাম নিকোলাই লিওনতিয়েফ। বিশ্বজোড়া নাম এঁর। এঁদের ক্রীড়া-কৌশল দেখার সুযোগ হল কলকাতাবাসীদের, কম কথা নয়। সার্কাস অনুষ্ঠিত হল তিনদিন ধরে, কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো দেখেছ।

স্টেডিয়ামে তিলধারণের জায়গাও ছিল না। রাশিয়ান সার্কাসের সুনাম তো আজকের নয়, বহু বহু দিনের। জিমন্যাসটিক্স ট্রাপিজ, ব্যালান্স, সব ব্যাপারেই রুশ খেলোয়াড়দের নাম আমরা শুনে আসছি বহুকাল ধরে। ওঁদের প্রশংসা করতেই হয়, কারণ ওঁরা যা দেখান, তাতে কোনো খুঁত থাকে না। তবে সত্যি বলতে কী, এই রুশ সার্কাস-দলের কৌশল দেখে আমার সব সময়েই মনে পড়ছিল আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের কথা। তাঁরাই বা কম কিসে?

গাবলু
BZZZ
5-8

গাবলু

# আসুন জ্বালানী বাঁচিয়ে রান্না করি—১

# প্রেসার কুকারে রান্না করাটা যদি রপ্ত করে নেন, তবে আপনার গ্যাস দ্বিগুণ সময় চলবে।

“কিন্তু আমি তো প্রেসার কুকারেই রান্না করি” হয়তো সব সময় করেন না। কিম্বা হয়তো আরো সঠিকভাবে প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে পারেন।

যেমন ধরুন, আপনি যদি কুকারে সেপারেটার বসিয়ে ভাত, ডাল, আর তরকারি তিনটে একই সংগে রাঁধেন, তবে অনেকটা জ্বালানী বাঁচাতে পারবেন। আর আপনার পুরো রান্নাটাই হয়ে যাবে কয়েক মিনিটে।

**প্রেসার কুকারে রান্না হলে জ্বালানী বাঁচে।**

প্রেসার কুকারে রান্নাটা হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আর কম খরচে। প্রেসার কুকারে রাঁধুন; শুধু তাতেই দেখবেন জ্বালানী খরচ ৩০% কমে গেছে।

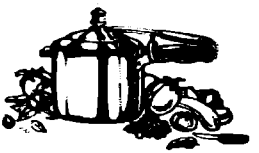



পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে প্রেসার কুকারে রান্না করে ভাতের বেলায় ২০% ভিজানো ডালের বেলায় ৪৬% এবং মাংসের বেলায় ৪২% জ্বালানী বাঁচে। এছাড়া সময় আর পয়সার সাশ্রয় তো বটেই।

**ঢাকনা দিয়ে তাপের অপচয় বন্ধ করুন।**

যে বাসনে রান্না করবেন তার মুখে ঢাকনা দিলেই ভাল। এতে তাপ পাত্রের

মধ্যেই থাকে। তাতে রান্নাও চটপট হয় আর ১৫% জ্বালানী কম লাগে।

**ছড়ানো ও চ্যাপটা ধরণের বাসন ব্যবহার করা ভাল।**

রান্নার বাসনের বাইরে যদি আঁচ বেরিয়ে যায় তবে তাপটা পাত্রে ঠিকমত লাগে না। অতএব জ্বালানীর বাজে

HTD-PCR-8086-A BEN

খরচ হয়। চ্যাপটা ও ছড়ানো পাত্র আঁচটা পুরোপুরি পায়, রান্নাও তাড়া-

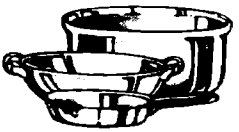



তাড়ি হয়ে যায়। ছোট বাসনে রান্না করতে হলে', আঁচটা কমিয়ে দিন। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বেশীর ভাগ স্টোভেই ২৫ সেন্টি-মিটার ব্যাসের বাসনই উপযুক্ত।

**রান্নার বাসন পরিষ্কার রাখবেন।**

অনেক সময়েই কেটলি এবং কুকারে নুনের একটা সূক্ষ্ম স্তর লেগে থাকে। এই স্তরটা যদি ১ মিলিমিটারেরও হয়, তাহলেও বাসনের ভেতরের মাল মসলায় তাপের সঞ্চারণ কমে যাবে। এতে আপ-নার জ্বালানী খরচ প্রায় ১০% পর্যন্ত



বেড়ে যাবে। সুতরাং সর্বদা বাসনের ভেতরটা ভাল করে মাজিয়ে নেবেন।

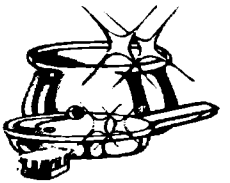

আমাদের পরীক্ষিত ইন্ধন সাশ্রয়ী নানান উপায়ের এই সহজ হদিশ ক'টা মেনে চলুন। এবং আরো কয়েকটা উপায়ের জন্য অপেক্ষা করুন। দেখবেন আপনার জ্বালানী, টাকা আর রান্নার সময়--কত কম লাগে। আপনার কেরোসিন স্টোভ অথবা গ্যাস সিলি-ণ্ডারের ওপরেও চাপ কম পড়বে, সেই সংগে সংসার খরচেও।

# একটু ভেবে দেখুন।

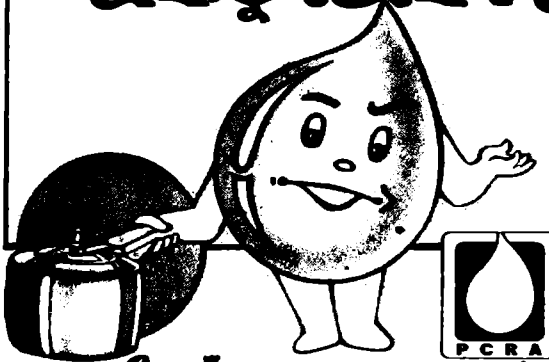



PCRA

পেট্রোলিয়াম
কনজার্ভেশন রিসার্চ
এ্যাসোসিয়েশন

৩০৬, সেঠী ভবন, ৭-রাজেন্দ্র প্লেস
নিউ দিল্লী-১১০০০৮

**কেরোসিন বাঁচান।**
**রান্নার গ্যাস বাঁচান।**
**কারণ তেল চিরদিন থাকবে না।**

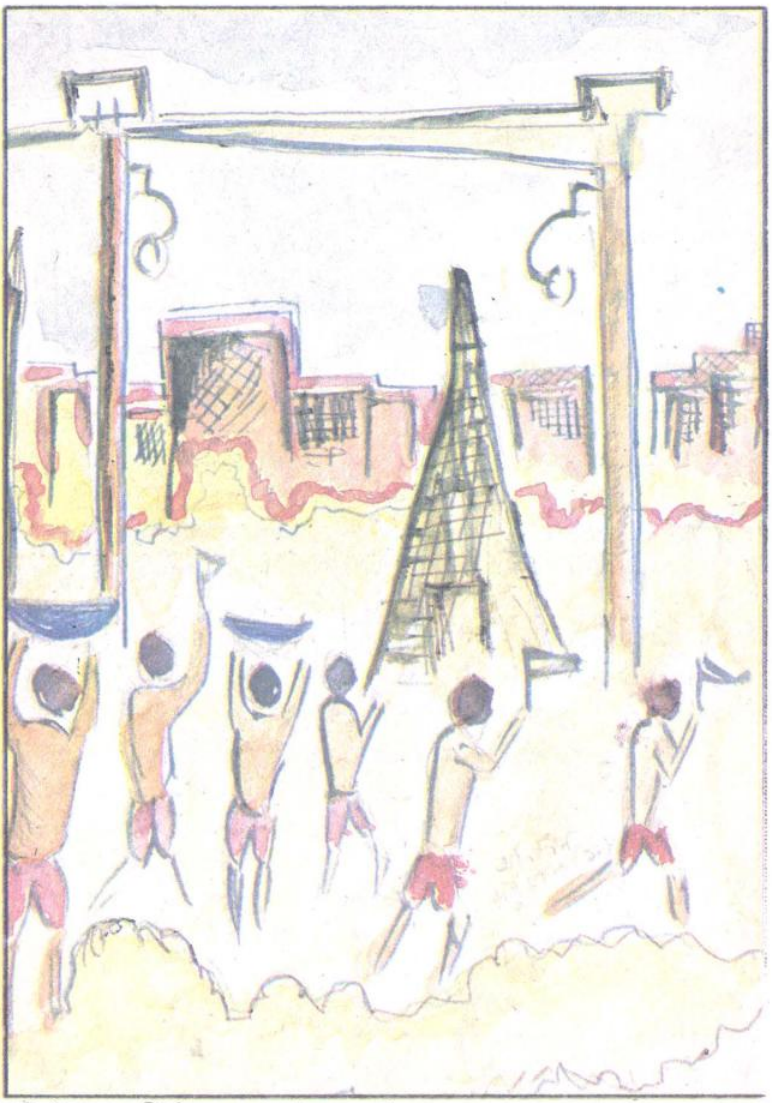

ছবি এঁকেছে **অনির্বাণ মজুমদার** (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে **সৌরভ ভট্টাচার্য** (বয়স ৮)

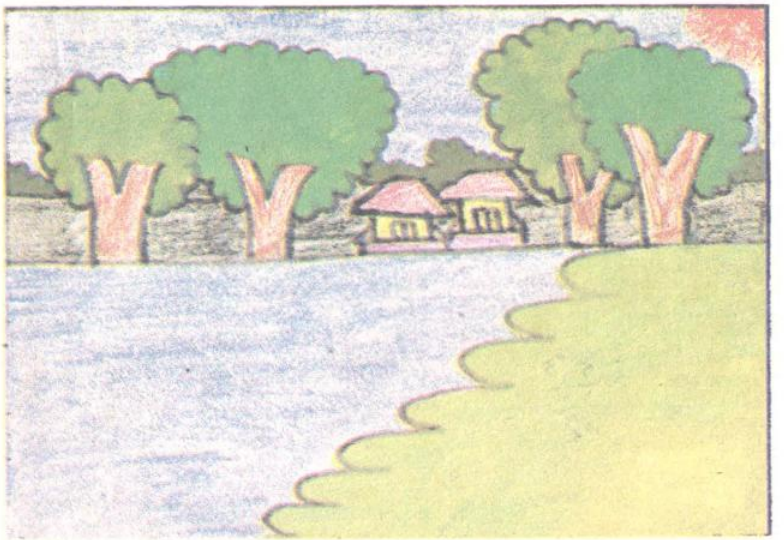

ছবি এঁকেছে **শুভজিৎ বসু** (বয়স ১০)

## একলা কাক

ঠিক দুপুরে
ছাদের পরে
একলা কাক
দিচ্ছে ডাক।

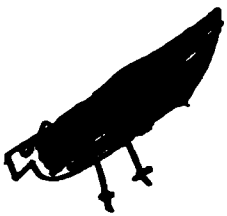

ছড়া ও ছবি ..
ঝিমলী সরকার
বয়স ৬

## ছোট্ট পুষি

ছোট্ট আমার পুষি
একটু পেলেই খুশি
নেই কোনো বায়না
মাছ আর দুধ পেলে
কিছু আর চায় না
লেখা ও ছবি
**মৌশ্রী বসু** (বয়স ৭)

## খরগোশ

খরগোশ খরগোশ
কেন করে ফোঁস-ফোঁস
বনে বনে থাকো তাই
মনে বুঝি সুখ নাই
লেখা ও ছবি
**ব্রততী ভট্টাচার্য** (বয়স ১০)

## রাতের বেলায়

একদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিক তখন চুপচাপ। মাঝে-মাঝে ঝিঁঝি পোকার ডাক কানে আসছিল। সারা দুর্গাপুর শহর বোধহয় গভীর ঘুমে অচেতন। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দু টো বাজল।

ঘড়ির আওয়াজ থামতেই খুট-খুট শব্দ কানে এল। শব্দটা কানে আসতেই আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। মনে পড়ে গেল, আমি একাই শুয়ে আছি। পাশের ঘরে মা, বাবা ও ভাই। আমি ভয়ে একদম বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। গলা দিয়ে আওয়াজও বার হচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর আমি আস্তে আস্তে বুকে সাহস সঞ্চয় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

বালিশের নীচে পেন্সিল-টর্চ ছিল। সেটাই হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলাম। তারপর ধীরে ধীরে শব্দটাকে লক্ষ করে এগোলাম।

বারান্দা থেকে আওয়াজ আসছিল। বারান্দায় পৌঁছেই আমি টর্চ জ্বাললাম, আর তক্ষুনি আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন ছুটে পালাল। আমি চমকে গিয়ে দেওয়ালের একপাশে সরে গেলাম। টর্চের আলোয় দেখলাম দুটো ইঁদুর আমাদের কাঠের তক্তপোশটাকে দাঁত দিয়ে ফুটো করছে।

আলো পড়তেই ইঁদুরদুটো দৌড়ে পালাল। সামান্য একটা ব্যাপারে অকারণে ভয় পেয়ে আমার নিজেরই খুব লজ্জা করছিল।

**অনিন্দ্য দাশগুপ্ত** (বয়স ১৪)

## বাঁদর ফুচকা খায়

আমরা পুজোর ছুটিতে দশদিনের জন্যে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন মাসি বললেন, "চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।"

সিনেমা থেকে বেরিয়ে আমরা ফুচকা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমার হাত থেকে ফুচকার ঠোঙাটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি, সামনের একটা গাছে বসে বাঁদরটা আরাম করে ফুচকা খাচ্ছে।

ফুচকা খাওয়ার পরে বাঁদরটা ঠোঙাটা আমাদের দিকে ছুড়ে দিল। তাই দেখে আমার ভাই হাততালি দিয়ে চিৎকার করে বলল, "বাঁদরেও তাহলে ফুচকা খায়!"

**শান্তনু বিশ্বাস** (বয়স ৭)

---

## বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে টুপটাপ
গাছ নড়ে দুপদাপ
করি আমি ছুটপাট
এটা-সেটা খুটখাট
মা মারেন চুপচাপ
বাড়ি হল চুপচাপ

**শ্রুতশ্রী চট্টোপাধ্যায়**
(বয়স ১১)

## হায় রাম

গরমেতে পাখা চলে
কী আরাম কী আরাম
ভুস করে থেমে গেল
হায় রাম হায় রাম

**সৌগত বাগচী**
(বয়স ১১)

বাঘা

কী বানাচ্ছিস হারু ?
পাখির বাসা।
এখানে খেতে-খেতে পাখিদের অভ্যাস হয়ে যাবে।
ফলে তারা রোজ আসবে।
ফলে তুই অন্য কোথাও যেতে পারবি না।
কেননা তুই অন্য-কোথাও গেলে পাখিরা অনাহারে থাকবে।

চকোলেটে ভরপুর, স্বাদ মজাদার
জিভে জল আনে, প্রিয় সবাকার

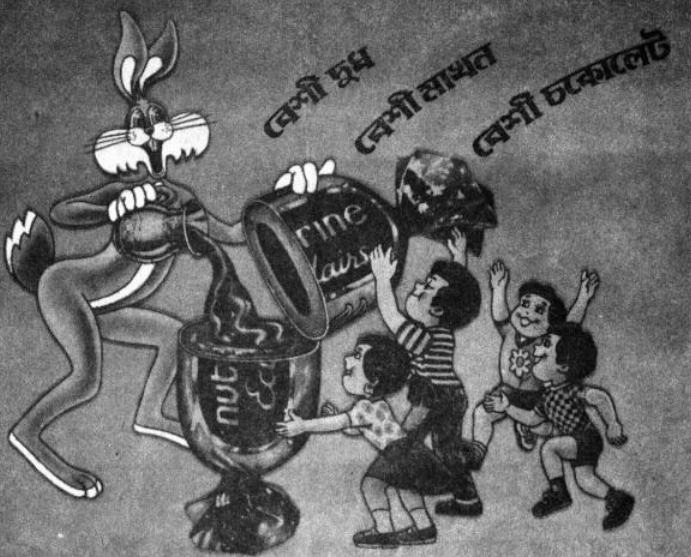


নিউট্রিন
চকোলেট Eclairs
ক্যারামেল শেল, চকোলেট সেন্টার
একটি স্যুইটে দুটির মজা

nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর স্যুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ. প্র.

CLARION/NC/8340

Regd. No. WBCC/264. MH—BY-SOUTH 683.

# রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

## ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর
টেরিবিন্থ।

রেক্সোনা মেখে স্নান করুন—এ আপনার ত্বক
রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে
রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের
যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

## রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS.RX.801810.BG